পূজনীয় অগ্রজ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীচরণেষু

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম ॥

মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা

এই লেখকের

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

গরীয়সী গৌরী

ভক্ত বিবেকানন্দ

১

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ

'তিনটে স হয়েছে কেন? শ—ষ—স?' শ্রীরামকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা।

'তুই লক্ষ্য করিসনি বাল্যকালে তোর মা তোর কানে একটি গূঢ়মন্ত্র দিয়েছেন—স, স, স—সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। কী করছিস রে? সহ্য করছি। সহ্য করাই তপস্যা করা।'

সহ্য করে কী হবে?

স-এর পরে কী আছে? হ। হয়ে ওঠ্। সইতে-সইতে হয়ে ওঠ্।

হে কাষ্ঠ, তুমি আগুন হয়ে ওঠো। হে দুগ্ধ, তুমি ঘৃত হয়ে ওঠো। হে সর্ষপ, তুমি তেল হয়ে ওঠো। তেমনি, হে মানুষ, তুমি ঈশ্বরায়িত হয়ে ওঠো।

আমেরিকাকে স্বামী বিবেকানন্দ বলছে, 'তুমি ঈশ্বরকে ব্যক্তি-স্বরূপ বলে নিতে না পারো নিও না, তুমি ঈশ্বরকে আদর্শস্বরূপ বলে নাও। কিসের আদর্শ? বৃহতের আদর্শ, মহতের আদর্শ, মধুরের আদর্শ। তুমিও কিয়ৎপরিমাণে বৃহৎ হয়ে ওঠো, মহৎ হয়ে ওঠো, মধুর হয়ে ওঠো। করার জন্যে করা নয়, হওয়ার জন্যে করা। হয়ে ওঠো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'জল কোথাও ধানের শিষে শিশিরবিন্দু, কোথাও গোষ্পদ, কোথাও গেড়ে-ডোবা, কোথাও পুষ্করিণী, দিঘি, সরোবর, হ্রদ—কোথাও নদী, কোথাও সমুদ্র। তুমিও কিয়ৎ-পরিমাণে জল—শীতল হয়ে ওঠো।'

তাকিয়ে দেখ তার গোপন গিরিগৃহ থেকে ক্ষীণা জলধারা বেরিয়ে পড়েছে। জানে না কোথায় তার অম্বুনিধি। বিশ্বাস করেছে কোথাও আছে তার পরম পরিণতির আশ্বাস। পরিণত হওয়াই

প্রাপ্ত হওয়া। তাই সে জলধারা নিজের ব্যাকুলতাকে গুরু করে নিরালা পথে বেরিয়ে পড়েছে—কোথায় পথ—'পথ আমাকে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।'

একটি বিপথগামিনী মেয়ে সারদামণির কাছে কেঁদে পড়ল। বললে, 'মা, আমি পথ হারিয়েছি।' মমতার নির্ঝরিণী মা-ঠাকরুন বললেন, 'মা, পথ কি কেউ হারায়? পথ পাবার জন্যেই তো পথ।'

পদে-পদে যেমন বিপদ পায়ে-পায়ে তেমনি উপায়। বিপথ বলে কিছু নেই। সমস্তই পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভাব যেমন পথ অভাবও তেমনি পথ। যেমন পথ বিশ্বাস তেমনি পথ সংশয়।'

উচ্চাবচ পথ ভেঙে-ভেঙে বহু বিস্তীর্ণ কাহিনী ও ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই জলধারা এগিয়ে চলেছে। শরবৎ তন্ময়। ক্রমে ক্রমে সেই জলধারা নির্ঝরিণী হয়েছে। নির্ঝরিণী বেগবিস্ফারিণী নদী হয়েছে। নদী পরিশেষে সমুদ্রে এসে মিলেছে, সমুদ্রকে পায়নি, সমুদ্রায়িত হয়ে উঠেছে।

আমরাও তেমনি বৃহৎ হতে মহৎ হতে মধুর হতে চলেছি। ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। আমরা ব্রহ্ম হতে চলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দর্শনে ঈশ্বরকে পাওয়া নয়, ঈশ্বর হয়ে ওঠা। ঈশ্বর কোনো পৃথক বস্তু নয়, বাড়িঘর চাকরিবাকরি নয়, বিষয়-আশয় নয় যে তাকে পেতে হবে। আমাদের মধ্যে রয়েছে যে বৃহতের সত্তা, যে ইয়ত্তাহীন পরিচ্ছেদ, যে ভূমা, যে ব্রহ্ম, তাতে প্রকাশিত হওয়া। বীজের মধ্য থেকে পত্রপুষ্পফলাঢ্য বনস্পতিকে উচ্ছ্বসিত করে তোলা।

'এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে। এই দেহমন ভূমানন্দময় হবে॥'

'কত তোকে সইতে হবে, কত তোকে বইতে হবে।' নরেন্দ্র-নাথকে বলছেন ঠাকুর, 'সহ্য করা ছাড়া তপস্যা কী। যত দুঃখকষ্ট

আসবে, জানবি সমস্ত শরীরের সমস্ত সংসারের। তুই থাকবি ঈশ্বর-আনন্দে ভরপুর। সমস্ত ধূমপঙ্কের উর্ধ্বে তুই বিশুদ্ধ নীলিমা, সর্বভাসক উপস্থিতি। দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

কিন্তু গোড়া থেকে নরেন্দ্রনাথের ঘোরতর সংশয়: 'ঈশ্বর কি আছেন?'

অস্তি—ভাতি—প্রিয়। অস্তি আছেন, ঠিক-ঠিক বিদ্যমান আছেন। ভাতি—প্রকাশিত হয়ে আছেন। আর প্রিয়—আনন্দময় হয়ে আছেন। বহিরন্তশ্চ ভূতানাং। যেমন তিনি তোমার ভিতরে আছেন তেমনি আছেন আবার বাইরে। জ্ঞানীর কাছে তিনি বোধ, ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তি।

'কিন্তু তিনি যে আছেন তার প্রমাণ কী?'

'তোর বাবা যে অমুক তার প্রমাণ কী?' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'কোনো প্রমাণ নেই। শুধু তুই তোর মাকে বিশ্বাস করে বাপকে চিনেছিস। তেমনি দ্যাখ, ব্রহ্মের সঙ্গে ঘর করেছে এমন মা পাস কিনা। তেমন মা যদি পাস আর সে যদি চিনিয়ে দেয় ব্রহ্মকে, কেন মানবিনে?'

তাই বলে অন্ধবিশ্বাস?

হ্যাঁ, অন্ধবিশ্বাস। বিশ্বাসের আবার চোখ কী। তার সবটাই অন্ধ। হয় বল্ বিশ্বাস, নয় বল্ জ্ঞান।

বিশ্বাস যত অন্ধ যত নীরন্ধ্র, তত সে অপ্রতিরোধ্য তত তার জোর বেশি। যত লোক গাড়ি চাপা পড়ে, পড়ে এখানে-ওখানে, উঠতে-নামতে, চকিত মুহূর্তের ভুলচুকে, সব চক্ষুষ্মান লোক। অন্ধ কি কখনো পড়ে? অন্ধ পড়ে না। তাকে একজনে ধরে। তার হাত ধরে পার করিয়ে দেয়।

আমি হাতধরা লোক পাব কোথায়? আমাকে কে ধরবে?

'যার জন্যে অন্ধ হয়েছিস সে ধরবে।'

কিছু সরাসরি মেনে নিতে চায়নি নরেন্দ্রনাথ। তর্ক করেছে, বিদ্রূপ করেছে। যুক্তিগ্রাহ্যতার মধ্যে বিষয়কে আনতে চেয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে যাকে ছুঁতে পারেনি, তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাতেই মহাখুশি। নিশ্চয়ই মহাজনকে বাজিয়ে নিবি, যাচাই করে নিবি। 'সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি, তবে নিবি।' কিন্তু অনুভবটাও তো যুক্তি। সুখানুভব দুঃখানুভব—এ-সব তো সত্য বস্তু। তেমনি ঈশ্বরও অনুভবের জিনিস, উপলব্ধির জিনিস।

সে কি, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের জিনিস নয়? তাঁকে চোখে দেখা যায় না?

বা, যায় বৈকি। ভক্তের কাছে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁকে দেখবার জন্যেই তো এ দেহ। চক্ষুর এত পিপাসা। তাঁকে সম্ভোগ করবার জন্যেই তো এ জীবন। 'শরীর ধারণ হরির কারণ।' যে জ্ঞানী, বৈদান্তিক, ব্রহ্মানন্দী, তার আত্মদর্শন, তার সোঽহং, সে নিজেই ঈশ্বর। আর যে ভক্ত, সে দাসোঽহং, তার দর্শন ভেতরেও যেমনি বাইরেও তেমনি। তার একবার 'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী', আরেকবার 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।'

শ্রীহরি যখন ধ্রুবকে দর্শন দিলেন, ধ্রুব বললে, তোমার এ সাক্ষাৎকারের কাছে কিসের ব্রহ্মানন্দ? নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদ আর এ সবিশেষ স্বরূপদর্শনের সুখ সমুদ্রের সমতুল।

তোমাতে আমি নিমগ্ন হতে চাই না, বিলীন হতে চাই না। তোমাকে আমি দেখতে শুনতে ধরতে ছুঁতে চাই। তোমাকে নিয়ে আসতে চাই আমার অনুভবের সীমার মধ্যে, সচেতন সাধনায় একটি সানন্দসুন্দর যথার্থ মূর্তির মধ্যে। আমার অল্পে সুখ নেই, অস্পষ্টে সুখ নেই, অগোচরে সুখ নেই। আমি চাই অবাধ দর্শন। অবারিত দর্শন। হে অখিলরসামৃতমূর্তি, তুমি আমার চোখের সামনে দাঁড়াও, তোমার সুধাদৃষ্টি আমার সমস্ত হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করে দিক। যেখানে বিরহবর্তিকা নিয়ে আমি একলা জেগে আছি সেখানে তোমার সঙ্গে আমার মুখচন্দ্রিকা হোক।

'বলি, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' বহু দরজায় ঘুরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এসে পড়ল।

'দেখিনি? যেকালে তিনি আছেন তাঁকে দেখব না? তবে চোখ দিয়েছেন কেন? তাঁর চোখের উপর রাখব না দু চোখ?'

'দেখেছেন?'

'দেখেছি বৈ কি। তোকে যেমন দেখছি, যেমন দেখছি ঐ গাছ মানুষ দালান তেমনি করে দেখেছি। স্পষ্ট, সুন্দর, উজ্জ্বল।'

'আমাকে দেখাতে পারেন?'

'পারি বইকি। যা আমি দেখেছি তা তুইও দেখবি। আমাকে তিনি দেখা দিয়েছেন তোকেও দেবেন। কেন দেবেন না? আমিও তাই এই বলে কাঁদতাম, মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কেন দেখা দিবিনে?'

বলে কী সাধু! দেখা যায়? আবার দেখানোও যায়? কী সুদৃঢ় সারল্যের সঙ্গে বলছে! কই নরেন্দ্রনাথ হেসে উড়িয়ে দিতে পারল কই? অপেক্ষা করতে লাগল।

'দিনের বেলায় তো তারা দেখতে পাও না তাই বলে কি বলবে তারা নেই?' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'যদি তারা দেখতে চাও তবে দিনান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করো। দুধের মধ্যে যে মাখন আছে তা কি দুধ দেখলে ঠাহর হয়? দুধকে আগে দধিতে ঘনীভূত করো, তারপর সূর্যোদয়ের আগে সে দধিকে মন্থন করো। তারপরে উদ্ধার করো সেই নিহিতকে।'

তোমার সুখদুঃখমন্থনধনকে।

যতক্ষণ এ দেহ ততক্ষণই সন্দেহ। সংশয়ই তো নিয়ে যাবে নির্ণয়ে। যতক্ষণ অহঙ্কার থাকবে ততক্ষণ অবিশ্বাসও থাকবে। আর যখনই অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু হবে, জানবে সেই হল আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা।

যে সন্দেহের নিরসনের জন্যে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সমীপস্থ

হয়েছিল, উত্তরকালে সেই সন্দেহেরই সম্মুখীন হয়েছে স্বামীজি। এবার সে জিজ্ঞাসু নয় এবার সে উত্তরদাতা।

'ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ কী?' দক্ষিণ-ভারতে স্বামীজিকে মুখোমুখি প্রশ্ন করল একজন।

'অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতির থেকেই বলা যায় তিনি আছেন।' বললে স্বামীজি।

'অতীন্দ্রিয় কাকে বলে?'

'তৃতীয় চক্ষুকে বলে।'

'দুই চোখেই সামলানো যায় না, আবার তৃতীয় চক্ষু!' জিজ্ঞাসু পরিহাস করল। বললে, 'এই দু চোখে কী করে বুঝতে পারি তাই বলুন।'

'তা হলে চোখের লেন্স্ বদলাও।'

'লেন্স্ বদলাবো?'

'হ্যাঁ, গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নাও।' বললে স্বামীজি, 'এমনি শাদা চোখে দেখছ একটা সরল পাতা—কতটুকু দেখছ? স্বচ্ছ কাচের উপর সেই পাতাটি রেখে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখ, দেখবে রূপের কত নিপুণ ও সূক্ষ্ম কারিকুরি। চোখে দেখা যায় না অথচ যা আছে তাই অতীন্দ্রিয়। চোখে ঠিক-ঠিক লেন্স্ লাগাও দেখবে সেই কারিগরকে। নইলে যা তোমার মননচিন্তনের বাইরে তাকে তোমার সীমাবদ্ধ যুক্তির মধ্যে আনবে কী করে?'

'রিয়্যালিটির কথা বলুন।' প্রশ্নকর্তা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'রিয়্যালিটি?' স্বামীজি বললে শান্তস্বরে, 'যাকে রিয়্যালিটি বলছ তা হচ্ছে ক্ষুদ্র স্বল্প মনের আচ্ছন্ন দৃষ্টি। চলন্ত ট্রেনে বসে দেখছ তীরের মত গাছ ছুটছে। কী, তাই দেখছ না? ঐ হচ্ছে তোমার রিয়্যালিটির চেহারা।'

'কিন্তু আপনি—আপনি দেখেছেন ঈশ্বরকে?' খৃস্টান কলেজের ছাত্র সুব্রহ্মণ আয়ার প্রশ্ন করে উঠল। 'দেখা যায় কখনো?'

এ সেই নরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

স্বামীজি এত দিন পরে বললে, 'দেখা যায়। আমি দেখেছি।'

এ সেই শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর।

মনে পড়ে কী রকম আজগুবি মনে হত—বলে কিনা কালী হাঁটে চলে কথা কয়, নাকের নিচে ধরলে সলতে কাঁপে, হাতে নিশ্বাসের স্পর্শ পাওয়া যায়। এ সংসারে এমন অলৌকিক কিছু ঘটতে পারে? এ নিশ্চয়ই চোখের ভুল, মাথার গোলমাল। যা হোক, রহস্য ধরে ফেলতে হবে। কোথায় কী যন্ত্র-তন্ত্র ইন্দ্রজাল আছে দেখব পরীক্ষা করে। কিন্তু কখন যাব? যাব দুর্যোগের মধ্যরাত্রে। যখন ঠাকুর একা থাকবেন। যখন কেউ আসবে না ভিড় করতে।

নিজেই পরে আবার অলৌকিককে প্রতিষ্ঠিত করছে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকৃতির এ কাব্যই তো অলৌকিক। 'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন জীর্যতি, ন মমার।' ঈশ্বরের কাব্য পুরোনো হয় না, অচল হয় না—প্রতিদিনের হয়েও চিরদিনের হয়ে থাকে। অলৌকিক আর কিছুই নয়, এমন একটা ঘটনা যার কারণটা সম্প্রতি অজ্ঞাত থেকে গেছে। যেই কারণটা জানা যাবে তখন আর সেটা অলৌকিক থাকবে না, বিজ্ঞান হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান কী বলে? বলে, যা আপাতপ্রতীয়মান, যা অনুমান-গ্রাহ্য তাই সত্য, যতক্ষণ না তুমি তার উলটোটা সাব্যস্ত করতে পারছ। নদীতে যদি জল বাড়ে সহজেই অনুমান করব কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। তুমি যদি বলো বৃষ্টির জন্যে নয় অন্য কারণে বেড়েছে, তোমাকেই সেই অন্যকারণ প্রমাণ করতে হবে। যদি ধোঁয়া দেখি, যুক্তিযুক্ত অনুমান করব, আগুন লেগেছে। তুমি যদি বলো ধোঁয়ার কারণ আগুন নয়, অন্য কিছু, সেই অন্য কিছুকে তোমাকেই স্থাপিত করতে হবে। এ সংসারে আমরা কী দেখি? কোনো জিনিসই আপনা থেকে চলে না নড়ে না ছোটে না ঘোরে না, একজন বুদ্ধিমান

চালক পিছন থেকে কল টেপে বা শক্তি জোগায় বলেই তা চলে নড়ে ঘোরে ছোটে। তাই যখন দেখি এ জগৎ সংসার চলছে ছুটছে ঘুরছে এগিয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধি খাটিয়েই অনুমান করতে পারি এর এক-জন চালক আছে। এখন তুমি যদি তার উলটোটা বলো, না, চালক নয়, একটা নির্বুদ্ধি অন্ধশক্তিতেই সে চলছে, তা হলে তোমাকেই তা প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং ঈশ্বরের প্রমাণের ভার আমার উপর নয়, তার বিপরীত অন্ধশক্তির প্র াণের ভার তোমার উপর।

চালক ছাড়া চলমানতা নেই এটাই আমার সহজ বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান যত বাড়বে বিস্ময়ও তত বাড়বে। একটা চাঁদে পৌঁছে হয়তো দেখা যাবে আরো কত চাঁদ। আরো কত সৌরজগৎ।

বিবেকানন্দ বলছে, 'শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান মহত্তম বিস্ময়ই ঈশ্বর।'

তবু, আবার বলছে, 'আধ্যাত্মিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষীকরণ। প্রত্যেককে নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে হবে সেটা সত্য কিনা। যদি কোনো ধর্মাচার্য বলে, আমি এই সত্য দর্শন করেছি, কিন্তু তোমরা পারবে কিনা সন্দেহ, তার কথা বিশ্বাস কোরো না। কিন্তু যে বলে তোমরাও চেষ্টা করলে দর্শন করতে পারবে কেবল তার কথা বিশ্বাস করবে।'

ডেট্রয়টে ডিনারের শেষে কফি নিয়ে বসেছে স্বামীজি। অভ্যাগতদের সঙ্গে গল্প হচ্ছে। পেয়ালা তুলে চুমুক দিতে যাবে, দেখল তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া।

সেই ইঙ্গিতই তো যথেষ্ট ছিল। না, চোখের ভুল কিনা কিংবা কে জানে হয়তো মাথার গোলমাল, যাচাই করে দেখতে হবে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল স্বামীজি—সত্যি ঠাকুর একেবারে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন। চোখে মুখে উদ্বেগ—দুশ্চিন্তার মালিন্য।

'ও কফি খাসনে।' বললেন ঠাকুর, 'ওতে বিষ দিয়েছে।'

কফির পেয়ালা নামিয়ে রাখল স্বামীজি, খেল না। বুঝল, ক্ষুদ্রাত্মা বিরুদ্ধবাদীদের কীর্তি।

প্রসন্ন হাসি হেসে ঠাকুর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'আচ্ছা, ঈশ্বরের স্বরূপ কী বলতে পারেন বুঝিয়ে ?' আয়ার জিগগেস করল স্বামীজিকে।

'তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র।' স্বামীজি বললে, 'শক্তি—এনার্জি জিনিসটা কী বলো তো বুঝিয়ে।'

আয়ার হতবুদ্ধি হয়ে গেল। দেখল এমন জিনিসও আছে যা বোঝা যায় অথচ বোঝানো যায় না।

'তুমি কুস্তি লড়তে পারো ?' জিগগেস করল স্বামীজি।

'পারি। লড়বেন ?' আয়ার আস্তিন গুটোলো।

'এসো না।'

মুহূর্তে পরাস্ত হল আয়ার। কী দেখছ ? লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাতকঠিন স্নায়ু, না কি ব্যায়ামের কৌশল ? আসল হচ্ছে, পেশী নয়, স্নায়ু নয়, নৈপুণ্য নয়—সমস্ত কিছুর অন্তরালে অদৃশ্য শক্তি।

ঈশ্বরের স্বরূপ কী জানতে চাইছিলে না ?

অল্পতার শেষসীমা পরমাণু, বৃহতের শেষসীমা আকাশ। তেমনি জ্ঞানক্রিয়াশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা জীবাণু বীজাণু, জ্ঞানক্রিয়াশক্তির আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

কে ঈশ্বর ?

যাঁর দ্বারা জন্ম স্থিতি ও লয় হচ্ছে তিনিই ঈশ্বর। যিনি অনন্ত শুদ্ধ নিত্যমুক্ত সর্বশক্তিমান। যিনি সর্বজ্ঞ পরমকারুণিক অখণ্ড প্রেমস্বরূপ।

সেই প্রার্থিত দুর্যোগের মধ্যরাত্রি উপস্থিত হল। জলঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল নরেন্দ্রনাথ। আহিরিটোলার ঘাট থেকে নৌকো নিয়ে চলল দক্ষিণেশ্বর। ধরে ফেলব, কী করে, কী বলে, কী দেখে—সমস্ত রহস্য উন্মোচন করব।

নরেন এসেছে টের পেয়েছেন ঠাকুর। অন্তরে-অন্তরে অপর্যাপ্ত

খুশি হয়েছেন সন্দেহ নেই কিন্তু বাইরে কাঠিন্য বজায় রেখে বলছেন, 'তুই আমাকে নিস না, মানিস না, তবু তুই আসিস কেন ?'

নরেন থমকে দাঁড়াল। সত্যিই তো আমি আসি কেন ? আমি বিশ্বনাথ দত্ত এটর্নির ছেলে, আমি ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি, স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট স্পেন্সার পড়া ফিলসফার—আমি কেন আসি ? কে কোথাকার এক গেঁয়ো মুখখু বামুন, কালী পেয়েছে কি না পেয়েছে তাতে আমার কী মাথাব্যথা ? আমি কেন আমার উত্তপ্ত সুখশয্যা ছেড়ে এই বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে কাঁপতে-কাঁপতে চলে এসেছি এতদূর ?

'বল্ কেন আসিস ? আমাকে নিস না আমাকে মানিস না তবু আসিস কেন ?' ঠাকুর আবার গর্জে উঠলেন।

যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেয়েছে সেই প্রশ্নের সামনেই নরেনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ঠাকুর। এবং সেই উত্তর সেদিন তাকে দিতে হল। বললে, 'আসি কেন ? আসি তোমাকে ভালোবাসি বলে।'

জীবনের এই শেষ উত্তর—ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরকে দরকার কেন ? মানুষকে ভালোবাসার জন্যে। যে ঈশ্বরকে ঠিক-ঠিক ভালোবাসে সে সমস্ত মানুষকে ভালোবাসে। মানুষকে মনে করে তার প্রভুর প্রতিভূ, তার মিত্রের মিত্র, তার নিজেরই আরেক প্রতিভাস। নয়ন তো নয়নকে দেখতে পায় না—কী করে দেখবে ? একটি দর্পণ নিয়ে এস। দর্পণ কোথায় পাব ? হে বন্ধু, তোমার দুটি নয়নই আমার দর্পণ। নয়নে-নয়নে নয়নানন্দকে নয়নাতীতকে নিরীক্ষণ করো।

মূলে জলসেচন করো, তাহলেই বৃক্ষ পুষ্পফলব্যাপ্ত হবে। গোড়া ছেড়ে আর সর্বত্র জল ঢাললে কোথায় তোমার পত্রশোভা, কোথায় বা পুষ্পকান্তি। সব ছেড়ে সেই এককে ধরো মূলকে ধরো শাখা ছেড়ে শিকড়কে আশ্রয় করো। সেখানে সন্তোষ করলেই সকলে সন্তোষ। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এক সাধে সব সাধে সব সাধে সব

যায়।' এক সাধ করলেই সব সাধ পূর্ণ হয়, অনেক সাধ করলে একটি সাধও মেটে না।

লক্ষ শূন্য যোগ করলেও শূন্য। এককে বসাও। বলছে স্বামীজি, সেই এককে না বসানো পর্যন্ত দশ হয় না, একশো হয় না, এক হাজার হয় না, লক্ষ-কোটি হয় না। সেই এককে নিয়েই সমস্ত। এককে বসালে, আর কিছু না হোক, অন্তত এক তো হবে।

সমস্ত শূন্যকে মূল্যবান করবার জন্যে অর্থান্বিত করবার জন্যে সেই এককে দরকার।

'খেতড়ির রাজপ্রাসাদ আমাকে কী দেবে? পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ড, আমেরিকাই বা আমাকে কী দেবে?' পায়ে হেঁটে চলেছে স্বামীজি আর বলছে পদব্রজী সঙ্গী সন্ন্যাসীদের: 'কী হবে আমার স্বর্ণে-রৌপ্যে কাষ্ঠে-লোষ্ট্রে বসনে-ভূষণে করণে-উপকরণে, স্তূপীভূত জড়ের জঞ্জালে? শুধু শূন্যের আস্ফালনে? যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তার ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে দিন কাটাতে আমি প্রস্তুত নই। আমি প্রতিষ্ঠা চাই না সম্মান চাই না সিংহাসন চাই না, সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে যিনি মূলশক্তি তাঁকে চাই।'

'কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।...দহিয়াছে অগ্নি তারে
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।
শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।'

কাম-কাঞ্চন তোমাকে কতদূর নেবে? পাশের বাড়ি, পাশের গাঁ, পাশের শহর—আর ঈশ্বর? ঈশ্বর নেবে তোমাকে দিগন্তের সমস্ত সীমারেখাকে অতিক্রান্ত করে পৃথিবী ছাড়িয়ে। এই অমৃত-পথযাত্রার সম্প্রসারের জন্যেই ঈশ্বরকে দরকার।

'ঈশ্বরকে ধরলে কী হয়? শিং বেরোয় না লেজ গজায়? কিছু হয় না। বুকটা মাঠ হয়ে যায়।'

একটা ঘরে কটা লোকের জায়গা হবে? একটা হল্-এই বা কটা লোকের? কিন্তু একটা মাঠ হলে? অঢেল অফুরন্ত মাঠ?

বুকটাকে মাঠ করবার জন্যেই ঈশ্বরকে দরকার। অপরিমাণ প্রেমে প্রসারিত হবার জন্যেই দরকার ঈশ্বরকে।

'তুই আমাকে নিস না, মানিস না, তবু তুই আসিস কেন?'

'আসি তোমাকে ভালোবাসি বলে।'

ঠাকুর তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আর সকলে আসে স্বার্থের জন্যে। নরেন আসে আমাকে ভালোবাসে বলে।'

'তখনই মানুষ যথার্থ ভালোবাসতে পারে যখন সে দেখতে পায় তার ভালোবাসার জিনিস কোনো ক্ষুদ্র মর্ত জীব নয়, খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নয়, স্বয়ং ভগবান।' বলছে স্বামীজি: 'স্ত্রী স্বামীকে আরো বেশি ভালোবাসবেন যদি তিনি ভাবেন স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিকতর ভালোবাসবেন যদি তিনি জানতে পারেন স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। সেই মা-ও সন্তানদের বেশি ভালোবাসবেন যিনি তাদের ব্রহ্মস্বরূপ দেখবেন। সেই ব্যক্তি তার মহাশক্রকেও ভালোবাসবে যে জানবে ঐ শক্রও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।'

এই বিরাটবিস্তার অনুভূতির জন্যেই ঈশ্বরকে দরকার।

'যা কিছু দেখছ, স্থাবর জঙ্গম, সমস্তই সেই এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ।' আমেরিকাকে বলছে স্বামীজি, 'সেই চৈতন্য-স্বরূপই আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর। যা কিছু সৃষ্টি সবই প্রভুর পরিণাম—আরো যথার্থ বলতে গেলে, প্রভু স্বয়ং। তিনিই

সূর্যে চন্দ্রে তারায় দীপ্তি পাচ্ছেন, দীপ্তি পাচ্ছেন অন্ধকারে, ঝঞ্ঝাবিদীর্ণ আকাশে। তিনিই জননী ধরণী, তিনিই মহোদধি। তিনিই শীতল বৃষ্টি, স্নিগ্ধ আকাশ, আমাদের রক্তের মধ্যে শক্তি। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। যার উপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই বেদীও তিনি, যে আলো দিয়ে আপনাদের মুখ দেখছি সেই আলোও তিনি। যিনি পরমাণু তিনিই ঈশ্বর। তিনিই সঙ্কুচিত হতে-হতে অণু, বিকশিত হতে-হতে আকাশ। তিনিই খণ্ডে-খণ্ডে অখণ্ড। জগৎপ্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই মানববুদ্ধি মানবযুক্তি পরিতৃপ্ত।'

এই অপূর্ব বিশ্বপ্রাণতাবোধের জন্যে ঈশ্বরকে দরকার।

ঈশ্বরকে মাথায় নিলে মানুষ কি ছোট হয়ে যায়, না, বড় হয়ে ওঠে? সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা এই ভেবে মানুষ কি নিষ্ক্রিয় হয়, আলস্যের জড়পিণ্ড হয়, না, তাঁর ইচ্ছা আমার জীবনে প্রস্ফুটিত করি এই প্রয়াসে প্রেরিত হয় সর্বক্ষণ? কাকে ধরে শোকে-দুঃখে নির্বিচল থাকি, বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করি, বৈমুখ্যে-বৈফল্যে সংগ্রহ করি নবতর সংগ্রামের তেজ? কে হতাশের আশা, নিঃস্বের সম্বল, চিরোৎকণ্ঠিতের শান্তি? কে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা? সমস্ত অন্যায়ের সংশোধন?

কিন্তু তোমার ঈশ্বর ক্ষুধার্তকে রুটি দিতে পারে? খাওয়াতে পারে নিরন্নকে? আমেরিকা স্বামীজির মুখের উপরে বিদ্রূপ করে উঠল।

'গান খাওয়াতে পারে? কবিতা খাওয়াতে পারে? যখন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখ তখন বলো, হে কাঞ্চনজঙ্ঘা, রুটি পাঠাও?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল স্বামীজি: 'ঈশ্বর এক অন্তহীন মহাসঙ্গীত, এক মৃত্যুহীন মহাকাব্য, এক ক্ষয়হীন সৌন্দর্য-নিকেতন। জীবনের এত বড় সম্ভোগ এ আমি কিছুতেই পারি না ত্যাগ করতে।'

'ফাউ কি কেউ ছাড়ে?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বর আমাদের

ফাউ। এক পয়সায় চারটে মুলো পাওয়া যায়, তার উপরে আরো দুটো ফাউ, কোনো বুদ্ধিমান লোক সেই ফাউ ছেড়ে দেয় না। যদিও দেয়ও, সংসার তাকে বোকা বলে। বলে, আর সকলে ছ-ছটা মুলো নিয়ে এল, আর তুমি এমন পণ্ডিত, ঠকে এলে, ছেড়ে দিয়ে এলে নিজের পাওনা? যাও, নিয়ে এস ফাউ। হায়, গিয়ে হয়তো দেখবে, দোকান উঠে গিয়েছে।'

আমরা এখানে কেউ ঠকতে আসিনি, ছাড়তে আসিনি, বোকা বনতে আসিনি, আসিনি দোকান বন্ধ দেখে ফিরে আসতে। সমস্ত প্রাপ্তির ঊর্ধ্বে ঈশ্বর এক মহত্তম উদ্বৃত্তি। তাতে আমার জন্মগত অধিকার। এ অধিকার আমি পারব না খোয়াতে। আমার যা হক, আমার যাতে স্বত্ব-স্বামিত্ব তা আমি নেব আদায় করে। নইলে আমি কিসের মানুষ? কিসের কী!

অশ্বিনী দত্ত বললে, 'আপনি মজার লোক।'

ঠাকুর বললেন, 'তুমি আমাকে ঠিক চিনেছ। আমি মজার লোক। যেহেতু ঈশ্বর একটা বড় মজা। বিনি পয়সার ভোজ। বিনি সাধনার ধন। এ ভোজ, এ ধন আমি ছাড়ি না।'

কোনো চতুর ব্যক্তিই ছাড়ে না। 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।'

বলছেন, আমি তোকে ঈশ্বরকথা বলতাম না, কিন্তু তুই যে সুখ চেয়েছিস, শান্তি চেয়েছিস, স্থান চেয়েছিস, আশ্রয় চেয়েছিস—বল, চাসনি? সুখ মানেই আরো সুখ। টাকা মানেই আরো টাকা। নামযশ মানে আরো নামযশ। শক্তি প্রতাপ মানে আরো শক্তি প্রতাপ। আরো আরো, আবার আরো, কেবল আরো। এক শৃঙ্গে উঠে আরেক শৃঙ্গে, তুঙ্গতর শৃঙ্গে, ওঠবার জন্যে লালসা। তুঙ্গতরে উঠে আবার উত্তুঙ্গতরের দিকে হাত বাড়ানো। অধিক থেকে অধিকতরের দিকে যেতে-যেতে—প্রতি পদক্ষেপে এই ইঙ্গিত করছি যে কোথাও না কোথাও আছে আমার অধিকতম। যার

পরে আর আরো নেই। যা পেয়ে আর কিছু পাবার আছে বলে মনে হয় না। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। সেই অধিকতম, পরমতম, পরিপূর্ণতমের নাম দিবিনে? তোর যা খুশি তুই নাম দে। আমি—আমি বলি ঈশ্বর।

'হ্যাঁ রে, ওরা কিছু আছে বলে মানে তো?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, নীতি বলে শক্তি বলে—'

'ঐ, ঐ, ঐই ঈশ্বর। শুধু চেহারার রকমফের।'

বিমূর্তে শক্তি, প্রমূর্তে শিবশঙ্কর।

'কিন্তু যাই বলুন, মূর্তিপূজা আমি বিশ্বাস করি না।' আলোয়ারের মহারাজা মঙ্গলসিং বললেন স্বামীজিকে। 'আপনি করেন?'

'করি।'

'কাঠ মাটি পেতল পাথর এদেরকে ভগবান ভাবেন?'

'ভাবি।'

'আমি যে ভাবতে পারি না, আমার কী উপায় হবে?' মহারাজার কথায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর।

'কী আবার হবে। ভাববেন না।'

সহসা দেয়ালে টাঙানো একটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকাল স্বামীজি: 'এটা কার ফটো?'

দেওয়ান এগিয়ে এল। বললে, 'মহারাজার।'

'ফটোটা নামান।' স্বামীজি আদেশ করল।

আদেশ পালন করল দেওয়ান। স্বামীজি তাকে এবার আরেক আদেশ করল, বললে, 'এটার উপর থুতু ফেলুন।'

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল দেওয়ান। স্বয়ং মহারাজাও নিস্পন্দ।

'থুতু ফেলুন। লাথি মারুন।' গর্জে উঠল স্বামীজি: 'কেন, কিসের কুণ্ঠা? এ তো তুচ্ছ একটুকরো কাগজ। এতে থুতু ফেলতে আপত্তি কী?'

'এ কী বলছেন ?' দেওয়ান মাথায় হাত দিয়ে বসল : 'এ যে মহারাজার প্রতিচ্ছবি।'

'তাতে কী ? এ তো খানিকটা কালিমাখা কাগজ। এর মধ্যে মহারাজা কোথায় ? এর মধ্যে প্রাণ কোথায়, রক্তমাংস কোথায় ? এ তো অনড় জড় ছাড়া কিছু নয়। এতে থুতু ছিটোলে থুতু তো কাগজে পড়বে, মহারাজার গায়ে পড়বে না। কী, ফেলুন থুতু।'

শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দেওয়ান।

স্বামীজি বললে, 'থুতু ফেলছেন না কেন তাও আমি বলে দিই। ফেলছেন না, যেহেতু এটা মহারাজার ছায়া, একে দেখলে মহারাজাকে মনে পড়ে। একে কলঙ্কিত করলে মহারাজাকেই অপমান করা হয়। তাই এ ছবি শুধু কালিমাখা তুচ্ছ কাগজ নয় এ ছদ্মবেশী মহারাজ।'

মঙ্গলসিংকে লক্ষ্য করল স্বামীজি : 'এক অর্থে আপনি এতে নেই, অন্য অর্থে আপনি এতে বর্তমান। আপনি নেই বলে একে ছিন্ন করা যায়, মলিন করা যায়, আবার আছেন বলে আপনার ভক্ত সেবকের দল একে শ্রদ্ধা করে প্রণাম করে। তেমনি প্রতিমা এক অর্থে মৃত্তিকা অন্য অর্থে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া। আমরা কি আর মাটিকে পূজা করি, মাটির মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা করি। আপনার সেবকেরা কি কাগজকে প্রণাম করে, কাগজের মাধ্যমে আপনাকেই প্রণাম করে।'

'কিন্তু তোমার ধর্ম যদি এতই ভালো, এতই উদার,' জিগগেস করল আমেরিকা, 'তবে তোমার দেশ এত দরিদ্র কেন, অধোগত কেন।'

'তাতে ধর্মের কী ?' স্বামীজি বললে, 'তাই বলে আমার ধর্ম কি দরিদ্র, আমার ধর্ম কি অধোগত ? কোথায় তুমি ছিলে হে আমেরিকা, যখন আমরা বিশ্বের অধিবাসীদের অমৃতের পুত্র বলে প্রথম সম্ভাষণ করেছিলাম—'

'তবু, যাই বলো, অনবরত আধ্যাত্মিকতার পিছনে ছুটতে গিয়ে তোমরা পার্থিবতাকে হারিয়েছ। ফাঁকা ভবিষ্যৎকে খুঁজতে গিয়ে হারিয়েছ বর্তমানকে। তোমাদের এই বুদ্ধি মানুষকে বাঁচতে শেখায়নি—'

'মরতে শিখিয়েছে।'

'কিন্তু আমরা বর্তমান সম্বন্ধে নিশ্চিত।'

'তোমরা কোনো কিছুর সম্বন্ধেই নিশ্চিত নও।'

'কিন্তু, যাই বলো, আদর্শ ধর্ম তাকেই বলব যা বাঁচতেও শেখায় মরতেও শেখায়—'

'ঠিক বলেছ,' সমর্থন করল স্বামীজি: 'আমরা তাই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রতীচ্যের পার্থিবতাকে মেলাতে চাচ্ছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা: খালি পেটে ধর্ম হয় না।

'ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তার কারণ মূর্খতা।' বলছে স্বামীজি, 'আমরা আজ চারযুগ ধরে কী করেছি? ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু পা দিয়ে দলেছি। ওদের ওঠবার শক্তি আমাদেরই জোগাতে হবে প্রাণপণে। আমাদের ধর্মের দোষ নেই, দোষ আমাদের। ধর্ম ঠিক-ঠিক পালন না করবার দোষ।'

কিন্তু ধর্ম কি দারিদ্র্য মোচন করতে পারে?

না, পারে না। কত কিছুই তো কত কিছু করতে পারে না। তলোয়ার দিয়েও তো দাড়ি কামানো যায় না। কলেজে ছাত্রদের নিয়ে দুরূহ কোনো বিজ্ঞানের ক্লাশ হচ্ছে, সেখানে ছোট একটা ছেলে ঢুকে পড়েছে। বলছে, এখানে কি লজেনচুষ পাওয়া যাবে? না, লজেনচুষ পাওয়া যাবে না। তোমারও সেই জাতীয় প্রশ্ন। না, বীণা দিয়ে ফসল ফলানো যাবে না। যার যেমন ওজন তাকে সেই আয়তনে বিচার করো। যা অনন্ত তাকে ক্ষণকালের নিক্তিতে মাপতে যেয়ো না।

ধর্ম অনেক কিছুই পারে না। না পারুক। কিন্তু একটা জিনিস পারে। হ্যাঁ, শুধু একটা জিনিস। স্বামীজি বললে, মানুষকে দেবতা করতে পারে। তাকে দিতে পারে অমৃত-আনন্দময় বিপুল জীবনের অধিকার।

ডেট্রয়েটের মিসেস ফাঙ্কি বললে, 'স্বামীজিকে দেখে আর সন্দেহ থাকে না মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি কেন? সে শুধু ঈশ্বর পাওয়া ঈশ্বর হওয়ার জন্যে।'

সেই স্বামীজি ঠাকুরের কাছে এসেছিল অদ্ভুত প্রার্থনা নিয়ে: 'আমাকে সমাধিস্থ করে দিন।'

যখন ঠাকুর তাকে অষ্টসিদ্ধি দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তখন কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল নরেন। বললে, 'অষ্টসিদ্ধি দিয়ে আমার কী হবে? তা দিয়ে কি আমি ঈশ্বরদর্শন করতে পারব?'

'না, তা পারবিনে। তবে কিছু ম্যাজিক-ট্যাজিক দেখাতে পারবি।'

'ম্যাজিক দেখিয়ে আমি কী করব? পায়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে কী লাভ যেখানে দু' পয়সায় খেয়ার নৌকোয় পার হওয়া যায়? সিদ্ধাইয়ের দাম দু পয়সা। দু' পয়সার বাজার করতে আসিনি সংসারে।'

সেই ম্যাজিকই দেখাতে বলছে আমেরিকা। বলছে, শুধু বক্তৃতাই দেবে, হাতে-কলমে কিছু করবে না? কিছু করে দেখাবে না? না দেখালে কী করে মানব তোমার ধর্ম খুব জোরদার?

কী দেখাব?

একটা রোপট্রিক দেখাও। একটা দড়ি শূন্যে ছুঁড়ে দেবে, সেটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর একটা লোক তাই বেয়ে-বেয়ে উঠে যাবে উপরে এবং অবশেষে শূন্যে লীন হয়ে যাবে। হিন্দুমাত্রই তো শুনেছি জাদুকর, সেই একটা কিছু ভেলকিবাজি দেখাও।

ধর্ম মানে ভেলকিবাজি নয়, ধর্ম সহজ সরল সুদৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, হাতসাফাইয়ের চালাকির উপর নয়। যে অজ্ঞানী সেই শুধু ভোজবাজির খোঁজ করে। যীশুখৃস্টকেও বলা হয়েছিল, ভেলকি দেখাও। যীশু বলেছিল, ভেলকিতেও তোমরা বিশ্বাস করবে না। যদি মৃত লোক কবর থেকে উঠেও আসে, তোমরা তা মানবে না—বলবে, লোকটা আদৌ মরেনি।

ও-সব কথা শুনছি না। যদি ম্যাজিক না দেখাও তা হলে তোমাকে এই ঘরে বন্ধ করে রাখলাম। যদি ম্যাজিক দেখাতে রাজী হও তবেই দরজার তালা খুলে দেব।

মিসেস ব্যাগলির বাড়িতে তখন আছে স্বামীজি, বাড়ির এক কোণে ছোট পড়ার ঘরে তাকে আটকে রাখা হল। দরজায় তালা লাগানো হল। চুপচাপ বসে থাকো স্থাণু হয়ে, চলবে না বাইরে বেরুনো।

বাড়ির আরেক প্রান্তে বৈঠকখানায় বহু লোক সমবেত হয়েছে, চলছে বিচিত্র কথাবার্তা। হঠাৎ দেখা গেল তাদের মধ্যে স্বামীজি উপস্থিত।

সে কী? তাকে দরজা খুলে দিল কে? কে আবার খুলে দেবে, চাবি তো এই আমার পকেটে। তবে কি জানলার শিক বেঁকিয়ে বেরুল?

চলো, স্বচক্ষে দেখে আসি। গিয়ে দেখল ঘরের দরজা যেমন-কে-তেমন তালাবন্ধ। তালা খুলে সবাই ভিতরে ঢুকল। দেখল যেমন-কে-তেমন স্বামীজি বসে আছে চেয়ারে। তন্ময় হয়ে বই পড়ছে।

এ-সব অতি তুচ্ছ জিনিস। অণিমা-লঘিমা-গরিমা-প্রাপ্তি। এ-সব দেখতে চেও না। যদি সত্যিই কিছু রূপান্তর দেখতে চাও দেখ এই বিবেকানন্দকে। কী করে এক সংশয়াচ্ছন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্ব-কণ্টকিত নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দে পরিণত হল। গর্বে পর্বতায়মান

অন্ধ অবিশ্বাস কী করে দাঁড়াল এসে ভক্তিতে বিশ্বাসে শরণাগতিতে।

'তোমার কিসের কী দয়াময়?' নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তেড়ে এল: 'যেখানে এত দুঃখকষ্ট অত্যাচার নির্যাতন অনৈক্য বৈষম্য সেখানে কোথায় কী ঈশ্বর? সব বুজরুকি, গাঁজাখুরি।'

অগাধ অমিয়দৃষ্টি, ঠাকুর শান্তস্বরে বললেন, কথা কোসনে। আকাশের দিকে তাকা।

একটি মহান সূক্ত। আকাশের দিকে তাকা। প্রতিনিয়ত তো মাটির দিকেই তাকিয়ে আছি, একবার আকাশের দিকে তাকাই।

আকাশের দিকে তাকালে কী দেখবি? পরমাণুপুঞ্জের মত কোটি-কোটি নক্ষত্র। এককেটা তারা সূর্যের চেয়ে কোটি-কোটি গুণ বড়। সেই অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে তোর এই পৃথিবী কী? সর্ষপপিণ্ড। একদানা সরষে। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, এক কণা ধুলো। সেই ধূলিকণার মধ্যে তুই! তোর হৃৎপিণ্ড, তোর মস্তিষ্ক, তোর বুদ্ধি, তোর ফুট-গজ-কম্পাস! কথা কোসনে। শুধু অহেতুকী কৃপা। তোর এই প্রাণকণা শুধু এক অহেতুকী কৃপা। সেই অহেতুকী কৃপার বিনিময়ে তাঁকে একটু অহেতুক অনুরাগ দিয়ে ফ্যাল। দিয়ে ফেলে ছাখ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

তাই বলছি বিবেকানন্দকে দেখ। ফলেন পরিচীয়তে—ফলকে দেখ। ললাটে ঈশ্বরের নির্ভুল ঠিকানা লেখা এক জ্বলন্ত জীবন্ত পুরুষই বিবেকানন্দ।

> 'সত্য মুদে আছে দ্বিধার মাঝখানে,
> তাহারে তুমি ছাড়া ফোটাতে কেবা জানে।'

সেই বিবেকানন্দ—তখনো নরেন্দ্রনাথ—ঠাকুরকে গিয়ে বললে, 'আমাকে সমাধিস্থ করে দিন। শুকদেবের মত আমি ব্রহ্মভূমিতে

লীন হয়ে থাকব, কদিন পর নেমে এসে আহার্য গ্রহণ করে দেহ-রক্ষা করে আবার চলে যাব ব্রহ্মভূমিতে—'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন : 'ছি ছি, তুই এত বড় ছোট লোক, তোর এত ছোট নজর? তুই তোর নিজের কাজ গুছিয়ে সরে পড়তে চাস? সোঽহং মানে কি আমি একলা? সোঽহং মানে আমরা সকলে। আমিছাড়া সকল নেই, সকলছাড়া আমি নেই। তুই একা নিজে রাজভোগ খাবি আর তোর বঞ্চিত পীড়িত ক্ষুধিত জনগণকে তার আস্বাদ দিয়ে যাবিনে? প্রহ্লাদ কী বলেছিল? বলেছিল, হে অচ্যুত, আমি একাকী মুক্ত হতে চাই না, আমার সঙ্গী এই সব অসুর বালকেরা অত্যন্ত দীন অসমর্থ, এদের আমি ছাড়তে পারব না। তাই আমার সঙ্গে এদেরকেও মুক্ত করুন। এক নিয়েই অনেক, অনেককে নিয়েই এক।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'কাজ করতে হবে। অনেক—অনেক কাজ।'

'পারব না।'

'তোর ঘাড় পারবে।'

'কী কাজ?'

'লোকশিক্ষা।'

'লোকশিক্ষা?'

'হ্যাঁ, মানুষকে শেখাতে হবে, হে মানুষ, তুমি ক্ষুদ্র নও খর্ব নও অল্প নও হ্রস্ব নও, তুমি নিরতিশয় তুমি অপরিমেয়। তুমি অনৃতের নও, তুমি অমৃতের পুত্র। তুমি অনন্ত শক্তির আধার, তুমি দ্বিবাহু হয়েও মহাবাহু। তুমি কেবলমাত্র অন্নাধীন নও, তুমি আবার পরমান্নভোজী।'

প্রতি মানুষকে এই অভয়ের সংবাদ এনে দিতে হবে। বনের বেদান্তকে নিয়ে আসতে হবে ঘরে-ঘরে। ঘরে-ঘরে আমার পট পুজো হবে, মঠে-মন্দিরে নয়, ঘরে-ঘরে। মানুষ দীনহীন ভাগ্যের

কার্পণ্যে বিড়ম্বিত নয়—সে তার অমোঘ মহিমা উদ্বারিত করবার জন্যে উদয় দিগন্ত থেকে উদার দিগন্ত পর্যন্ত যাত্রা করেছে—তাকে দিতে হবে অক্ষয় পাথেয়। তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ যে পুরুষ, সেই পুরুষই সে। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।

তাই জীবে সেবা নয়, জীবে পূজা। বিবেকানন্দ বলছে, সেবা বললে আমার ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশিত হবে না। জীবে পূজা। নিরন্নকে অন্ন দাও, পীড়িতকে শুশ্রূষা দাও, নিরালম্বকে আশ্রয় দাও —এ সেবা তো সেবা মাত্র—এ তো যে কোনো প্রতিষ্ঠানই করতে পারে, আর রাষ্ট্রই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই চলে যেতে পারে দারিদ্র্য। কিন্তু তার চেয়ে আরো একটা বড় সেবা আছে, যেটা পূজার পর্যায়ে। বিদ্যাদানই শ্রেষ্ঠ সেবা, আর অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যার মধ্যে গরীয়সী। মানুষকে এই তত্ত্ব শেখাও যে মানুষ, তুমিই ব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপ। তুমিই একমাত্র অনন্তের আয়তন। জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।

স্বামীজি বলছে, এই সব মানুষ এই সব পশু, তোমার এই সব স্বদেশবাসী এরাই তোমার ঈশ্বর, এরাই তোমার প্রথম উপাস্য। যদি ঈশ্বরকে মানুষের মুখে না দেখতে পাও তবে তাকে মেঘে বা কোনো মৃত জড়ে বা তোমার নিজ মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কী করে দেখবে? মনুষ্যে ঈশ্বরোপাসনা এই বেদান্তের আদর্শ।

'অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি, ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজো মানুষে খুঁজবে। মূর্তিমান বেদান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না? মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখনই পূর্ণজ্ঞান।'

যা রামকৃষ্ণ তাই বিবেকানন্দ। এ নয় যে একে অন্যের পরিপূরক। এ নয় যে বিবেকানন্দ জ্ঞান আর কর্ম আর রামকৃষ্ণ ভক্তি। কেউই আংশিক নয়, দুইই স্বসম্পূর্ণ। রামকৃষ্ণও জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি; বিবেকানন্দও জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি।

রামকৃষ্ণ মন্ত্র, বিবেকানন্দ উচ্চারণ। রামকৃষ্ণ উৎস, বিবেকানন্দ উৎসার।

'কাঠে আগুন আছে এ জানলে কি ভাত রান্না হবে? হবে না। আগে কাঠের আগুনকে বার করো।' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'কী করে করবে? আরেকটা কাঠ নিয়ে এস। বেগে ঘর্ষণ করো। আস্তে-আস্তে ঘষলে চলবে না। দ্রুত হও, দীপ্ত হও, দৃঢ় হও। বেগে ঘর্ষণ করে প্রসুপ্ত আগুনকে জাগ্রত করো। তারপর আগুন পেয়েই বা কী হবে? সে আগুনকে কাজে লাগাও। ভাতটা রান্না করো। রান্না করেই বা কী হবে? খাও, আস্বাদ করো। অন্নময় অমৃতময় হয়ে ওঠো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জেনেছেন, করেছেন, খেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দও এই জ্ঞান কর্ম আর ভক্তির সমন্বয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আধেয়, বিবেকানন্দ আধার। শ্রীরামকৃষ্ণ অগ্নি, বিবেকানন্দ উদ্ভাসন।

কাঠের মুক্তি কাঠে। তেমনি তোমার মুক্তি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে। নিরুদ্ধ বক্ষে করাঘাত করো। জাগো জাগো এবার প্রসুপ্ত বহ্নি। দৈন্যশীর্ণ শীতশুষ্ক শাখায় বাতাসের ব্যাকুলতা, জাগো এবার বনশোভনা পুষ্পমঞ্জরী। মুক্তি মানে বিমোচন নয়, মুক্তি মানে উন্মোচন।

কাশী শুধু জানা নয়, কাশী যাওয়া, পরে কাশী দেখা। কাশী সর্বপ্রকাশিকাকে সম্ভোগ করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ, কিছু খেতে পাচ্ছেন না। নরেন্দ্রনাথ জোরজার করে তাঁকে মন্দিরে পাঠিয়েছে ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করতে, যাতে তিনি খেতে পারেন।

'ওরে নিজের জন্যে মাকে কিছু বলতে পারি না।'

'তোমার নিজের জন্যে কে বলছে? আমাদের জন্যে বলবে।' বললে নরেন্দ্রনাথ, 'তোমার গলা দিয়ে কিছু নামছে না, কিছু খেতে

পাচ্ছ না, এ কষ্ট দেখতে পাচ্ছি না আমরা। আমাদের কষ্ট লাঘবের জন্যেই তুমি মাকে বলবে।'

প্রায় ঠেলেঠুলে মন্দিরে পাঠাল ঠাকুরকে। কতক্ষণ পরে ঠাকুর ফিরে এলেন। নরেন্দ্রনাথ বললে, 'কি, কী, বলেছিলে মাকে ?'

'বলেছিলাম।'

'কী বললেন মা ?'

'বললেন, তোর এক মুখ বন্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে। তুই তো শতমুখে খাচ্ছিস। তোর নরেন খাচ্ছে বাবুরাম খাচ্ছে রাখাল খাচ্ছে—এ কি তোর খাওয়া নয় ?'

দেশ কাল নিমিত্তের জাল সরিয়ে ফেললে সবই এক, এক অখণ্ড সত্তা—এই অখণ্ডস্বরূপই ব্রহ্ম। বলছে স্বামীজি। আর এই ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের নেপথ্যেও আছে বলে প্রতীত হয় তখন সে ঈশ্বর। ঈশ্বরই একমাত্র পুরুষ, সমগ্র ও অবিভক্ত। সকল হাতে সে কাজ করছে, সকল মুখে খাচ্ছে, সকল নাকে শ্বাস নিচ্ছে, সকল মনে চিন্তা করছে। সে অনন্তকে কেন খণ্ড-খণ্ড দেখাচ্ছে এ যদি প্রশ্ন করো তবে বলি এ একটা আপাতপ্রতীয়মানতা মাত্র। অনন্তের বিভাজন নেই। অতএব আমি-তুমি অংশ মাত্র এ ভাবনা সত্য নয়। আমিও সেই তুমিও সেই। এ জ্ঞানই জ্ঞান আর বাকি সব অজ্ঞান। 'এক জানার নাম জ্ঞান আর অনেক জানার নামই অজ্ঞান।'

'আমরা সবাই রাজা আমাদের এ রাজার রাজত্বে।'

যদি রাজা পাগল হয়ে আপন দেশে রাজা কোথায়, রাজা কোথায়, বলে ছুটে বেড়ায়, খুঁজে বেড়ায়, সে কোনোদিন রাজার উদ্দেশ পাবে না, যেহেতু সে নিজেই রাজা। নিজেকে রাজস্বরূপ বলে জানো। জানো তোমার এ দারিদ্র্য সত্য নয়, তোমার এ খণ্ডতা সত্য নয়, তোমার এ বদ্ধতা সত্য নয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ

থাকে সে তুমিই। তুমি যদি ঈশ্বর না হও তা হলে ঈশ্বর কোথাও নেই, কোথাও হবেও না। আর যদি পাপ বলে কিছু থাকে তবে এ বলা পাপ আমি দুর্বল বা অপরে দুর্বল।

তারপরে কর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্বামীজি শোনাচ্ছে আমেরিকাকে: 'জীবনে একরতি বিশ্রাম পাননি—চাননি। জীবনের প্রথমাংশ গেছে ধর্ম-উপার্জনে আর শেষাংশ গেছে ধর্ম-বিতরণে। ঠিকই বলতেন, ভক্তের দুই লক্ষণ, এক রস-আস্বাদন আরেক রস-বিতরণ। দলে-দলে লোক আসত তাঁর কথা শুনতে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা তিনি তাদের কথামৃত বিতরণ করতেন। গলায় ঘা, শরীরের কষ্টকে কষ্ট বলেই মানতে চাইতেন না, যদি একটি মানুষেরও উপকারে আসতে পারি, তাকে দিতে পারি এক বিন্দু উপশম, বলছেন ঠাকুর, তাহলে হাজার হাজার শরীর আমি দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

আর স্বামীজি নিজে? নিরবচ্ছিন্ন কর্ম আর সংগ্রামের প্রতিমূর্তি।

'চিরকাল বীরের মত চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মত শীঘ্র আর বজ্রের মত অটল। আমি লড়াইয়ে কখনো পেছপা হইনি। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে, মিনমিনে ভিনমিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব, তুমি চিরকাল বলতে, এ বীর। আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। যা কখনো করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিইনি, আজ কি তাই হবে? হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হটে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ, কিন্তু না লড়েই হারব? মা আমায় মানুষ দিন, যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে—এমন একজনও যদি দেন, তবে কাজ করব, তবে আবার আসব। নইলে জানলুম, মায়ের ইচ্ছা এই পর্যন্ত।'

'পূজা তার সংগ্রাম অপার
সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'

কিন্তু জ্ঞান আর কর্ম দাঁড়াবে কোথায়? দাঁড়াবে ভক্তিতে। ভালোবাসায়।

'একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে তাহলেই হয়ে গেল।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

পথ কথা নয়, কথা হচ্ছে ভালোবাসা। কথা হচ্ছে একবার মন দিয়ে ফেলা। ঢেলে দেওয়া, বিকিয়ে দেওয়া, বিলিয়ে দেওয়া। নিজের জন্যে বিন্দুমাত্র না রাখা।

'ঝিনুক বালিকেই মুক্তো করে, তেমনি প্রেম মানুষকেই ঈশ্বর করে তোলে।' বলছে স্বামীজি: 'প্রেমের তিন কোণ। এক—প্রেম কিছু প্রার্থনা করে না, দুই—প্রেম ভয়শূন্য, তিন—প্রেম সবসময়েই আদর্শতমের উপাসনা। আর শুধু ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বর সন্নিহিত।'

জ্ঞান থেকে কর্ম, আর কর্ম থেকেই ভক্তি—শ্রীরামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দ অভেদ। একজন সূক্ত আরেকজন তার ভাষ্য। একজন শঙ্খ আরেকজন তার নির্ঘোষ।

'চল, একবার পণ্ডিতকে দেখে আসি।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন নরেন্দ্রনাথকে।

কে পণ্ডিত? শশধর তর্কচূড়ামণি।

তুমি মুখখু-সুখখু মানুষ, তোমার পণ্ডিতের কাছে যাবার সাহস কী!

তার জন্যেই তো তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছি। যদি তেমন কোনো কথা ওঠে তুই তর্ক করতে পারবি।

কিন্তু কী দরকার?

ওরে গুণদর্শনই ব্রহ্মদর্শন। শশধরের ওখানে ঈশ্বর বিদ্যারূপে

মেধারূপে পাণ্ডিত্যরূপে প্রকাশিত। যেখানে যতটুকু গুণবিকাশ সেইখানে ততটুকু ঈশ্বরপ্রকাশ। চল দেখে আসি, নমস্কার করে আসি।

চলুন। তর্কের আশায় উদ্যত নরেন্দ্রনাথ।

ঠাকুরকে চোখের সামনে আবির্ভূত দেখে শশধর তো অবাক।

কী ভাগ্য তুমি এসেছ। শশধর তার জামার বোতাম খুলে বুক অনাবৃত করল। বললে, ঠাকুর, জ্ঞানচর্চা করে করে আকণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে, একটু হাত বুলিয়ে দেবে ?

ঠাকুর শশধরের রিক্ত বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন আর শশধর ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'ডাইলিউট হয়ে গিয়েছে।'

সমস্ত জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধি তর্ক পাণ্ডিত্য বিগলিত হয়েছে ভক্তিতে। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি।' পরমবেদ্যকে জানা নয়, পরমবেদ্যকে ভালো-বাসতে জানার নামই বিদ্যা।

'প্রভু কহে বিদ্যামধ্যে কোন বিদ্যা সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা নাহি আর॥'
'পড়ে কেন লোক ? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥'

'মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।' শুধু ভক্তিতেই হবে। একমাত্র ভক্তিতেই ঈশ্বর বশংবদ। ভক্তির সাধনে কিছুই লাগে না, না জ্ঞান না বৈরাগ্য না অন্যতর অনুষঙ্গ। ভক্তি অন্য-নিরপেক্ষ।

ঠাকুরের সে কী আনন্দ। 'নরেন আমার মাকে মেনেছে।' সমস্ত রাত মায়ের গান গেয়েছে—'মা, ত্বং হি তারা, ত্রিগুণধরা পরাৎপরা। তোমায় জানি গো দীনদয়াময়ী দুর্গমেতে দুঃখহরা।'

তাই অমরনাথে 'সোঽহং শিবোঽহং' বলে শেষ হল না, বিবেকানন্দ ক্ষীরভবানীতে এসে মা. মা. বলে কাঁদতে লাগল।

এই ভালোবাসাই 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে।' এই ভালোবাসাই 'কলসে কলসে ঢালি তবু না ফুরায়।'

'এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নেই। সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অহেতুকী কৃপা, বদ্ধজীবের জন্যে সে প্রগাঢ় সহানুভূতি—এ জগতে আর দেখিনি।' চিঠি লিখছে বিবেকানন্দ : 'তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কখনো আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর করেননি—আমার লক্ষ অপরাধ মার্জনা করেছেন—এত ভালবাসা আমার মা-বাবাও বাসেনি। এ কবিত্ব নয়, অতিরঞ্জন নয়, এ কঠোর সত্য। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা করো, বলে কেঁদে সারা হয়েছি—কেউই উত্তর দেয়নি—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার যাই হোন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জেনে নিজে ডেকে অপহরণ করেছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনো তিনি থাকেন আমি বারংবার প্রার্থনা করি—হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা অহেতুকদয়াসিন্ধু, আমার এই বন্ধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।'

রামকৃষ্ণই পরিপূর্ণ প্রেম। এবং বিবেকানন্দও।

২

কর্মযোগী বিবেকানন্দ

পথিক পথের সন্ধানে বেরিয়েছে।

ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে তিন দিকেই পথ। অমুক গাঁয়ে যাব, কোন পথটা ধরি? কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। একজন কাউকে জিগগেস করলে হয়।

দেখল বুড়ো মতন একটা লোক তার বাড়ির দরজার গোড়ায় বসে আছে চুপচাপ। বেশ প্রাচীন লোক বলেই মনে হচ্ছে। পথের হদিস দিতে পারবে বোধ হয়।

পথিক জিগগেস করল, 'অমুক গাঁয়ে যাব কোন পথে? সে গাঁ এখান থেকে কতদূর?'

প্রশ্ন বুড়ো কানেও তুলল না।

পথিক আবার জিগগেস করল, 'বলুন না কোন পথে যাব?'

বুড়ো আগের মতই নীরব হয়ে রইল।

'সে কী, কানে শুনতে পান না নাকি? না কি বোবা?' পথিক তিরস্কার করে উঠল।

তবুও বুড়ো নির্বাক।

'এ তো এক অদ্ভুত লোক দেখছি। হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না।' পথিক আবার মুখিয়ে উঠল: 'যদি না জানেন তাই বলুন। আর যদি জানেন একটু সাহায্য করতে দোষ কী।'

বৃদ্ধ পূর্ববৎ উদাসীন।

অগত্যা পথিক নিজের বুদ্ধিতেই একটা পথ ধরে অগ্রসর হল।

যেই পথিক চলতে আরম্ভ করেছে অমনি সেই বৃদ্ধ তাকে ডাকতে সুরু করল চেঁচিয়ে: 'ও মশাই, শুনছেন? ও মশাই, শুনুন—'

এ তো মজা মন্দ নয়। পথিক ফিরল।

'আপনি অমুক গাঁয়ের কথা জিগগেস করছিলেন না? সে

গাঁ-টা ওদিকে নয়, এদিকে।' বৃদ্ধ আরেক দিকের রাস্তা দেখিয়ে দিল : 'আর দূর কতটা ? তা বেশি নয়, মাইল খানেক।'

পথিক রুখে উঠল : 'এতক্ষণ এত অনুরোধ-উপরোধ করছিলাম, একটা শব্দও তো করেননি, এখন জানাবার কী দরকার ?'

বৃদ্ধ হাসল। বললে, 'যতক্ষণ জিগগেস করছিলেন, নিষ্ক্রিয়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই সাহায্য করিনি। এখন দেখছি নিজের বুদ্ধিতেই হাঁটতে সুরু করেছেন, তাই জানিয়ে দিলাম।'

স্বামী বিবেকানন্দ তার মাদ্রাজী শিষ্য-বন্ধু আলাসিঙ্গাকে লিখছে : 'আলাসিঙ্গা, গল্পটা মনে রেখো। যে কাজ করে, যে কাজে লাগে তাকেই ভগবান পথ দেখান। যে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে নয়।'

নিরন্তর চেষ্টা, নিরন্তর আগ্রহ—নিরন্তর দাঁড় টেনে যাওয়া। অতন্দ্র সূর্যের মত কাজ করা।

এগিয়ে যাও, শুধু এগিয়ে যাও। ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে নৌকো ছেড়ে দাও।

এক কাঠুরে বন থেকে সরু সরু কাঠ কেটে এনে কোনো রকমে দুঃখেকষ্টে দিন কাটাত। একদিন পথে এক লোকের সঙ্গে দেখা। সে কাঠুরেকে বললে, বাপু এগিয়ে যাও। পরদিন কাঠুরে সেই লোকের কথা শুনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল মোটা-মোটা কাঠের জঙ্গল। সেদিন মোটা কাঠ কেটে এনে আগের চেয়ে বেশি পয়সা পেল। পরদিন ভাবল, এগিয়েই তো যেতে বলেছিল, আরো একটু এগিয়ে দেখি না কেন ? এগিয়ে গিয়ে দেখল চন্দনের বন। কাঠুরেকে আর পায় কে ? চন্দনের বন পাওয়া যাবে এ তার কল্পনার অতীত। চন্দনকাঠ বেচে-বেচে আণ্ডিল হয়ে গেল কাঠুরে। পরে আবার ভাবলে, থামি কেন ? লোকটা তো এগিয়ে যেতে বলেছিল। আবার এগোলো কাঠুরে। দেখল তামার খনি। তামায়ও থামা নেই। আবার এগোলো।

শেষে রুপো সোনা হীরে—তারপর শেষ দেউড়ি পেরিয়ে স্বয়ং রাজা।

'কাঠুরে, তুই দূর বনে যা, দূর বনে যা এই বেলা।
কেঠো বনে কাল কাটালি মিটল না তোর জঠরজ্বালা॥
শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন বলে মেলে ধন দূর বনে গেলে—রে কাঠুরে,
ও তুই, এবার যা দূর বনে চলে, পাবি চন্দনের চ্যালা॥
আরো যদি যাস এগিয়ে, রজত-খনি দেখবি গিয়ে—রে কাঠুরে,
ওরে, তারো ধারে সোনা হীরে মনি-মানিক রত্ন মেলা॥
তোর নিজের মাঝে আছে সে বন যদি না পাস তার অন্বেষণ—রে কাঠুরে,
ধর ওরে রামকৃষ্ণচরণ, সেবন যার করেন কমলা॥'

'এগিয়ে যাও, আরো এগিয়ে যাও।' বলছে বিবেকানন্দ, 'জীবনের অর্থই বৃদ্ধি অর্থাৎ বিস্তার। বিস্তার আর প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না। ভালোবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে।'

বিশ্রাম অর্থ কর্ম থেকে বিরতি নয়, কর্মান্তরগ্রহণ। কর্মেই আমাদের ছুটি। নদী ছুটি পায় স্রোতে, প্রবাহে, আগুন ছুটি পায় শিখায়, পুষ্পগন্ধ ছুটি পায় বাতাসে, বাতাসের বিস্তারে। তেমনি আমাদের ছুটি নিরবচ্ছিন্ন কর্মে, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মে, বিনিময়ের প্রত্যাশাবিহীন ভালোবাসায়।

'ক্রীতদাসের মত নয়, প্রভুর মত কাজ করো।' বলছে স্বামীজি। কর্মকে ত্যাগ করে নয়, কর্মের মধ্যে নিজেকে ত্যাগ করে। কর্মকে ফলের দিকে পাঠিয়ে নয়, ঈশ্বরের দিকে পাঠিয়ে। ঈশ্বরই পরম ফল। কর্ম-অর্পণই ব্রহ্ম-তর্পণ। যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

একটি মেয়ে সারদামণিকে প্রশ্ন করল, 'মা, কালীকে ফল দেব। ফল দিয়ে কী প্রার্থনা করব?'

সারদামণি বললেন, 'মাকে বলবে, মা, এই ফল নাও আর ফলের যে ফল তাও নাও।'

'ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনি রে
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণ সমীরে।...
জানিনে ভাই, ভাবিনে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরাখসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে বাজবে সেদিন তালে তালে
চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি মধুর মধু যামিনীরে॥'

এই চরম দেওয়ায় জন্যে কর্ম করে যাওয়া। আর এই চরম দেওয়া কাকে? আমার পরমতমকে।

আমার সেই পরমতম, আমার সেই ঈশ্বর কোথায়?

প্রহ্লাদকে তার বাবা হিরণ্যকশিপু জিগগেস করল, তোমার হরি কি এই স্তম্ভেও আছেন?

প্রহ্লাদ বললে, আছেন।

প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করল হিরণ্যকশিপু। স্তম্ভ চূর্ণ হয়ে গেল। নৃসিংহ বেরিয়ে এলেন। স্তম্ভ কী? দম্ভের স্তম্ভ এই দেহ। বেরুল কে? তুমিই বেরুলে সিংহরূপে। অর্থাৎ অহং বিচূর্ণ হলেই আত্মা আবির্ভূত হল। তুমি নৃসিংহ, অহঙ্কারের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিলে, যেই অহঙ্কার বিলুপ্ত হল অমনি তুমি তোমার মহৎস্বরূপে সিংহস্বরূপে প্রকাশিত হলে। সেই অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার জন্যেই আঘাত। আর এই আঘাতই কর্ম। কঠিন কর্ম। নিষ্ঠুর, নির্বিরাম কর্ম।

ঈশ্বর কোথায়? শ্রীরামকৃষ্ণ আরো সহজ করে সর্বব্যাপক করে বললেন। কোথায়? 'যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছ সেইখানে।'

অর্থাৎ তুমি যে সংসারে যে পরিবেশে যে কর্মে নিয়োজিত আছ

সেই সংসারে সেই পরিবেশে সেই কর্মে। জল কোথায় নেই? মাটির নিচে সর্বত্র জল, সুচির নীরনিবাস। খনন করো। খনন করে উদ্ধার করো তাপভঞ্জন তৃষ্ণার পানীয়। হলে হল, না হলে না হল, এই গয়ংগচ্ছ ভাব ত্যাগ করো—হতেই হবে। খুঁড়তে খুঁড়তে বালি বেরুল ছেড়ে দেওয়া চলবে না, পাথর বেরুল ছেড়ে দেওয়া চলবে না। আরো গভীরে যাও, আরো গহনে যাও, সেই-খানেই রয়েছেন তোমার গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ। তাকে উদ্ধার করে জীবনে উৎকীর্ণ করে যেতে হবে।

ভূমি কী? দৃঢ় প্রত্যয়ই তোমার ভূমি। আর খননাস্ত্র কী? কর্মই খননাস্ত্র।

যেহেতু তুমি বীর যেহেতু তুমি বিবেকানন্দ সেইহেতু তোমার জন্যে রুক্ষ রুষ্ট প্রস্তরকঙ্করাকীর্ণ ভূমি নির্ধারিত হয়েছে। যোগ্য প্রত্যুত্তর দাও। মরুভূমির বিশুষ্ক বক্ষ থেকে টেনে আনো তৃষ্ণাহরণ জলধারা।

বিবেকানন্দ সেই প্রত্যুত্তর।

'নরেন আমার খানদানী চাষা, বারো বচ্ছর অজন্মা হলেও চাষ ছাড়ে না।'

লাঙলে একবার হাত দিয়ে আর পেছন ফিরে তাকানো নয়। বলছে স্বামীজি। লাঙলে হাত দিয়েও যে পেছন ফিরে তাকায় তার আর ফসল্ হয় কই?

'যদি বৃষ্টি না হয়, ফসল মারা যায়, তা হলে কী করবি?' বন্ধুদের জিগগেস করল নরেন্দ্রনাথ: 'তা হলে কি চাষ ছেড়ে দিয়ে দোকান করবি?'

বন্ধুরা বললে, 'না, আরেকবার, আরো একবার চাষ করব।'

নরেন্দ্রনাথ বললে, 'সহস্রবার চাষ করব। যতক্ষণ পরাঙ্মুখ পাথরে অঙ্কুর না জাগছে ততক্ষণ চাষ ছাড়ব না।'

'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' পরমতমকে প্রাপ্ত হবার পর নিবৃত্ত হব। তার আগে নয়। তার আগে কদাচ নয়।

এই তোমার দুয়ারে আসন জমিয়ে বসলাম। উঠব না হটব না সরব না নড়ব না কিছুতেই। আর যাকে খুশি তুমি হটিয়ে দাও সরিয়ে দাও আমাকে পারবে না। আমি একটা হেস্তনেস্ত করে যাব। হয় ধরে নয় মরে। হয় তোমার ঘরে মিলন নয় তোমার দুয়ারে মৃত্যু। ঘর-দুয়ার এক করে ছাড়ব।

এ ভঙ্গি বীরের ভঙ্গি, ভক্তের ভঙ্গি, শরণাগতের ভঙ্গি। আর শরণাগতি মানে নিষ্ক্রিয়ের মত বসে থাকা নয়, কুড়েমি নয়, 'বৈরিগ্যি' নয়—শরণাগতি মানে এগিয়ে গিয়ে ধরা, জোর করে রোক করে ধরা। উদ্দাম হয়ে ছোটা, নেই-আঁকড়ার মত ধরা, বিরক্ত করে আদায় করে নেওয়া—এই তিন কর্মেই পরা প্রাপ্তি।

ধার্মিকের লক্ষণই নিয়তকর্মশীলতা। কর্মপরায়ণ থাকাই ধর্ম-পরায়ণ হয়ে ওঠা। কার্মিকই ধার্মিক।

পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না। মন্থন না করলে মাখন তোলা যায় না। জমি পাট করে না নিলে বপন-রোপণ ব্যর্থ হবে। গলা না সাধলে কোথায় সুরসঙ্গম? আর হাত রাঙাবি, মেদি পাতা বাটতে হবে না?

আগে মেদি পাতা তোলো, জলে ভেজাও, তারপর তাকে ছেঁচ, বাটো, নিংড়োও, তারপরে হাত রাঙাও। তেমনি কর্ম দিয়ে জীবন রঙিন করো। কী করলাম সেটি প্রশ্ন নয়। করতে-করতে কী হলাম সেটি প্রশ্ন। মন্দিরে কটি দীপ জ্বাললাম সেটা প্রশ্ন নয়, নিজেও দীপ হয়ে জ্বললাম কিনা সেটা প্রশ্ন।

'মহারাজ, আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

গিরিগোবর্ধনের দিকে যাচ্ছে স্বামীজি, পায়ে হেঁটে, খালি পায়ে। প্রতিজ্ঞা করেছে, কোথাও ভিক্ষে করবে না, থাকবে নিরাহারে। ঈশ্বরের করুণা চাইতে যাব কেন, যদি করুণা বলে কিছু থাকে তা আপনা থেকেই প্রতিমূর্ত হবে।

জঠরে দুঃসহ ক্ষুধা, দুই পায়ে গুরুভার ক্লান্তি, তবু এগিয়ে

চলেছে স্বামীজি। থামব না, বসব না, হা-পিত্যেশ করব না। যখন মৃত্যু আসবে তখনই ক্ষান্ত হব। তার আগে নয়, কিছুতেই নয়।

'মহারাজ, আপনার জন্যে খাবার এনেছি—' পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল।

এ মিথ্যা এ ভ্রম এ মরীচিকা। পেছন ফিরে তাকাল না স্বামীজি।

প্রখর রোদ ছিল এখন সুরু হল বৃষ্টি। রোদ-বৃষ্টি সমান, শ্মশান-ভবন সমান, তৃণ-হিরণ্য সমান, শত্রু-মিত্র সমান। রোদে যখন হেঁটেছি বৃষ্টিতেও হাঁটব।

'মহারাজ, শুনুন, আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

এ কী ছলনা! এ কোন প্রলোভনের হাতছানি!

ক্রমশই সে-ডাক নিকটবর্তী হচ্ছে। তার মানে পেছনের লোক ছুটে আসছে তাঁকে ধরবার জন্যে। বটে? স্বামীজিও ছুট দিল। পশ্চাৎ মৃত, পশ্চাৎ মিথ্যা। কিছুতেই প্রলুব্ধ হব না, পশ্চাৎপদ হব না।

শুধু ভগবানই ভক্তকে পরীক্ষায় ফেলে না। ভক্তও ভগবানকে পরীক্ষায় ফেলে। আর, ভগবানও শক্তের ভক্ত, নরমের যম। আর সবচেয়ে শক্ত কে? ভক্তই শক্ত। কিছুতেই তার বিরতি-বিচ্যুতি নেই, স্খলন-পতন নেই।

ক্লান্তির দরুন বেশি দ্রুত ছুটতে পারল না স্বামীজি, পেছনের লোক তাকে ধরে ফেলল। ঈশ্বরের কৃপাশক্তি মানুষের শারীর-শক্তিকে অভিভূত করল। মহারাজ, আপনার জন্যে খাবার এনেছি। বলে সেই লোক খাবারের পুঁটলি খুলে ধরল।

কে তুমি? কী করে জানলে আমি ক্ষুধার্ত? এ খাবার কোত্থেকে সংগ্রহ করলে? কে পাঠাল তোমার হাত দিয়ে? প্রশ্নও করল না স্বামীজি। খেতে সুরু করে দিল। যদি এখনো কিছু

প্রমাণ চাও এই তো প্রমাণ। বিজনে-প্রান্তরে এই আহার্যের আবির্ভাব।

বীরের মত এগিয়ে চলো, তা হলেই তোমার খাদ্য তোমার অমৃত এসে জুটবে।

'বীরের মত এগিয়ে চলুন,' নিউইয়র্ক থেকে ডাক্তার রাওকে লিখছেন স্বামীজি : 'সর্বদা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় হোন, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিন। নেতার আদেশ মেনে চলুন। সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির বিশ্বাসভাজন হোন। এই জীবন ও ব্যক্তিগত চরিত্রই সমস্ত শক্তির উৎস।'

আর কর্ম—কর্মই উপাসনা।

রসকে মেথর দক্ষিণেশ্বরের চত্বর ও অঙ্গন ঝাঁট দেয়, নর্দমা পরিষ্কার করে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে জিগগেস করলে, 'ঠাকুর, আমার কি গতিমুক্তি হবে?'

'কেন এ কথা জিগগেস করছিস? কিসে তোর এ সন্দেহ?'

'ঠাকুর, আমি হীন কর্ম করি—'

'হীন কর্ম?' ঠাকুর বললেন, 'কর্ম কি কখনো হীন হয়? কর্ম কর্ম। কর্মের কোনো বিশেষণ নেই। ঈশ্বর যাকে যা কাজ দিয়েছেন কর্তব্য দিয়েছেন তাই ঠিক-ঠিক করে যেতে পারলেই গতি-মুক্তি। তুই কোথায়? এ নারায়ণই মেথর সেজে নর্দমা সাফ করছে—ছলরূপী নারায়ণ—মেথর-নারায়ণ।'

এঞ্জিনের ছোট নাট বা বলটু—আসলে ছোট নয়, বিরাট এঞ্জিনকে চালাবার আয়োজনে তারও বৃহৎ অংশ আছে। সেই ছোট নাট বা বলটু খুলে নাও, সমস্ত এঞ্জিন বিকল হয়ে যাবে। এই জগৎনাট্যে আমিও যদি ঐ রকম নাট বা বলটু হই, আমিও হীন নই, অশ্রদ্ধেয় নেই। আমিও এই নাট্যের সামগ্রিক সাফল্যে সার্থক অংশীদার। আমার 'পার্ট' যদি খারাপ হয় তা হলে সমস্ত নাটকই খারাপ হয়ে যায়।

আমাকে কাজে কে লাগিয়েছেন ? কে আমাকে পার্ট দিয়েছেন ? আমার সত্যিকার ওপরআলা কে !' সত্যিকার ওপরআলা ঈশ্বর। তিনিই একজনকে মুনিবের পার্ট দিয়েছেন আরেকজনকে চাকরের পার্ট। দুজনকেই সার্থক অভিনয় করে যেতে হবে। রঙ্গমঞ্চে কেউ কারু ছোট নয়। চাকরের পার্টেই মাতিয়ে দিতে হবে। কাউকে যদি মৃত-সৈনিকের পার্ট দেওয়া হয়, তাকে স্ট্রেচারে করে রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এলে তাকে থাকতে হবে মৃত সেজে, নিশ্বাস রুদ্ধ করে। নইলে মৃত-সৈনিক যদি শুয়ে-শুয়ে শরীর কাঁপিয়ে নিশ্বাস ফেলে, সমস্ত নাটক ভণ্ডুল হয়ে যায়। আমি যদি এ জীবনে মৃত-সৈনিকের পার্টেই মনোনীত হয়ে থাকি তবে তাই আমি সুষ্ঠুভাবে, সুচারুরূপে করে যাব, নাটককে ভণ্ডুল হতে দেব না।

কোনো কাজই তুচ্ছ নয় ক্ষুদ্র নয় অকিঞ্চিৎ নয়, যদি এই বোধ আসে যে এই কাজের ভার যিনি দিয়েছেন তিনিই ভগবান। এই বোধ এই যুক্ততার চেতনাই কর্মের কৌশল।

যোগঃ কর্মসু কৌশলং। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ববুদ্ধি তাই যোগ। সিদ্ধিতে হর্ষ বা অসিদ্ধিতে বিষাদ দুইই ত্যাগ করে কর্ম করতে হবে। এ সমচিত্ততা কার পক্ষে সম্ভব ? যে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করেছে তার পক্ষে।

'ভারতীয় যোগের কথা আমাদের কিছু বলবেন ?' আমেরিকার এক শহরে কতগুলো কৃষি ও পশুপালন শেখা যুবক স্বামীজিকে তাদের ফার্মে নিমন্ত্রণ করল।

'বেশ, বলব।'

'ভারতীয় যোগটা কী বস্তু, এককথায় বুঝিয়ে দিতে পারেন ?'

'পারি।'

'কী ?'

'নির্বিচলতা। সর্ব অবস্থায় অনুদ্বিগ্ন থাকা।'

'বেশ, যাবেন বলতে।'

নির্ধারিত দিনে একটা খোলা মাঠে একটা পিপের উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজি বক্তৃতা সুরু করলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ছেলের দল শুনছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে কতগুলি ছোকরা স্বামীজির দিকে গুলি ছুঁড়তে সুরু করল। দেখো গুলি যেন গায়ে না লাগে, শুধু এ পাশ ও পাশ দিয়ে চলে যাক। দেখি একবার তার কর্মের কৌশল, কেমন সে নির্বিচল থাকে।

কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে বেরিয়ে যেতে লাগল গুলি, একচুল নড়ল না স্বামীজি। একবিন্দু চাঞ্চল্য বা কৌতূহল দেখাল না। থামল না এক নিশ্বাস। ভয় নেই চিন্তা নেই বিক্ষেপ নেই বিক্ষোভ নেই, নিজের কর্তব্য নিজের বক্তব্য শেষ করলে।

'কাউকে ছোট কিছু করতে হচ্ছে বলে যদি সে অভিযোগ করে,' বলছে স্বামীজি, 'তবে সে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই অভিযোগ করবে। সর্বক্ষণ অসন্তোষ আর অভিযোগ—এতেই জীবন দুঃখময় হয়ে উঠবে আর সমস্ত কিছুই পণ্ড হয়ে যাবে। যাই কর্তব্য হোক, সেই কর্তব্যে যে নিয়ত অবিচল থেকে অগ্রসর হতে পারে সেই আলোকের সন্ধান পায়, উচ্চ থেকে উচ্চতর কর্তব্যে তার ডাক পড়ে।'

একটি গৃহস্থ মেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছে। অভিযোগের সুরে বললে, 'আমি কিছু করি না, আমার কী হবে?'

'কর না মানে?' কী কর না?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'পুজো-আচ্চা করি না, মঠে-মন্দিরে যাই না, মন্ত্র নেই, দীক্ষা নেই, সাধন-ভজন নেই,—কিছুই করি না—'

'কিন্তু কর-টা কী?'

'হাতাখুন্তি নাড়ি।'

'হাতাখুন্তি নাড়ো? তুমি তো তা হলে বিরাট সাধন করছ।'

'বিরাট সাধন?'

'হ্যাঁ, তুমি হাতাখুন্তি নেড়ে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করছ। সেই অন্নব্যঞ্জনে তুমি তোমার নারায়ণরূপী স্বামী, গোপালরূপী পুত্র, গৌরীরূপিণী কন্যার সেবা করছ। আর সেই রান্নায় এমন এক মশলা এনে মেশাচ্ছ যা বেনের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না—তা হচ্ছে তোমার পরিজনদের প্রতি অনুরাগ—মঙ্গলেচ্ছা। তুমি সাধন করছ না? সার্থক সাধন করছ।'

তোমার কর্মে এই মহৎ ভাবনাটি যুক্ত করো। তোমার সমস্ত কাজই পূজা হয়ে যাবে।

কী করছিস রে? আফিসে কলম পিষছি। কে বলে? কালীনাম দুর্গানাম লিখছিস।

তা ছাড়া আবার কী! তিন আঙুলে যে কলম ধরেছিস এটা শুধু কলম ধরা নয়, এটা পূজার মুদ্রা-রচনা। আর লেজারে যে আঁক আঁকছিস, কে বলবে এ চামুণ্ডা-বগলার মূর্তি নয়?

কর্ম আর ধর্ম। কর্মের বানান ক—দিয়ে, ধর্মের বানান ধ—দিয়ে। এইটুকু যা তফাৎ, বাকিটা সমান। যতক্ষণ ক-এর আঁকড়িটা নিচের দিকে মাটির দিকে স্বার্থের দিকে আছে ততক্ষণ সেটা কর্ম। যেই আঁকড়িটা ঊর্ধ্বে তুলে দেবে, ঈশ্বরের দিকে, তখনই কর্ম ধর্ম হয়ে যাবে।

'আমি শুধু এক ধর্ম মানি।' বলছে স্বামীজি, 'সে ধর্মের নাম পরোপকার।'

পর, উপ, আর কার। পর মানে পরম, মানে ঈশ্বর। উপ মানে সমীপস্থ হওয়া। উপাসনা মানে কাছে গিয়ে বসা, উপবাস মানে কাছে গিয়ে বাস করা। আর কার মানে কার্য। এমন একটা কার্য যা তোমাকে ঈশ্বরের সমীপস্থ করে দেবে।

'মুক্তি-ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। পরোপকারের জন্যেই সাধুদের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি

পরের জন্যেই সমুদয় ত্যাগ করবেন। তোমার ভালো করলেই আমার ভালো হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান তুনিয়াতে সব করছে, আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন? অতএব, আর কিছু নয়, শুধু কাজে লেগে যা।'

পরোপকারে কার উপকার? নিজের উপকার। কোনো স্বার্থ নেই আসক্তি নেই ফলাশা নেই, শুধু পরের জন্যে কাজ করে যাওয়া, এ তো জীবনের পরম সুযোগ ও পরম সৌভাগ্য। স্বামীজি বলছে, 'পরোপকার আমাদের জীবনে এক আশীর্বাদস্বরূপ।'

'আমাদের কৃত উপকারের জন্যে কেন আমরা প্রতিদান আশা করব? যাকে সাহায্য করছ তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাকে ঈশ্বর-বুদ্ধি করো। মানুষকে সাহায্য করে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পাওয়া কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নয়? আসক্তিশূন্য হয়ে কাজ করতে পারলেই আর তুঃখ নেই অশান্তি নেই।'

'যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত উচ্চ মতবাদ হোক যত সুবিন্যস্ত দার্শনিক তত্ত্বই তাতে থাকুক, যতক্ষণ তা মত বা পুস্তকে আবদ্ধ ততক্ষণ তাকে আমি ধর্ম নাম দিই না। চোখ আমাদের পিঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সামনে অগ্রসর হও, আর যে ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে গৌরব করো তার উপদেশগুলি কার্যে পরিণত করো—ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করুন।'

'যথার্থ ভালোবাসা কখনো নিষ্ফল হয় না। একদিন সত্যের জয় হবেই প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মানুষকে ভালোবাস? তা হলে ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাচ্ছ জিগগেস করি। দরিদ্র তুঃখী তুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগে তাদের উপাসনা করো না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করে কেন কূপ খনন

করছ? প্রিয় বৎস আলাসিঙ্গা, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি। দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্যে নরকে যেতেও প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ বলে বিশ্বাস করি।'

তাই বিবেকানন্দ ডাক দিল: গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যা, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাবা নির্বংশ। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি-ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যা, মেতে যা, উন্মাদ হয়ে যা।

কাজ না করে উপায় কী? অকর্মকৃৎ হয়ে কে থাকতে পারবে? কর্মহীন হলে শরীরযাত্রাও নির্বাহ হবে না। ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে কাজ করো। অন্যতর কাজই বন্ধনের কারণ। যে অনাসক্ত সেই পরমপদ লাভ করে।

গীতায় অর্জুনকে কী বলছেন কৃষ্ণ? বলছেন, স্বর্গমর্ত্যপাতালে তিন লোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্তও কিছু নেই, প্রাপ্তব্যও কিছু নেই, তবু আমি অতন্দ্রিত কাজ করে চলেছি, শুধু লোকহিতের জন্যে। সূর্য হয়ে আলো দিচ্ছি, আগুন হয়ে তাপ দিচ্ছি, মাটি হয়ে শস্য দিচ্ছি, মেঘ হয়ে জল দিচ্ছি। কর্মে আমার অবকাশ নেই আলস্য নেই। আমি যদি কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি তা হলে আমার দৃষ্টান্ত দেখে মানুষও কর্মত্যাগ করে বসে থাকবে। সৃষ্টি উচ্ছন্নে যাবে। তুমি অলস হয়ে থেকো না, আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে ফলাভিসন্ধি-রহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ করো।

আগে শক্তিমান হও পরে শান্তির কথা বোলো। বুদ্ধই সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু যে ভিক্ষুক সে কী ত্যাগ করবে? যদি অশুভের প্রতিকারের শক্তি না থাকে তা হলে তোমার সেই অক্ষমতাকে প্রেম বোলো না। শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি

প্রতিকারচেষ্টাশূন্য থাকো তা হলে বুঝতে পারি তুমি উচ্চতম আদর্শে উপনীত হয়েছ। এই আদর্শে পৌঁছবার আগে মানুষের কর্তব্য অশুভকে প্রতিরোধ করতে শেখা। অন্যায়ের প্রতিকার করেই অপ্রতিকার-রূপ শ্রেষ্ঠ শক্তি আয়ত্ত করা যায়। তাই, স্বামীজি বলছে, কাজ করো, সংগ্রাম করো, যতদূর সম্ভব মহোদ্যমে আঘাত করো। প্রতিকারের শক্তি যার নেই তার কিসের ক্ষমা কিসের অপ্রতিকারধর্ম।

'ঈশ্বরলাভের জন্য আমাকে কী করতে হবে? কী উপায়ে আমি মুক্ত হব?' একজন জিগগেস করল স্বামীজিকে।

লোকটাকে স্বামীজি চিনত। অত্যন্ত অলস, অজ্ঞ, নির্বোধ, পশুবৎ জীবন যাপন করছে। স্তূপীকৃত নিষ্ক্রিয়তা।

স্বামীজি তাকে প্রশ্ন করল: 'তুমি মিথ্যে কথা বলতে পারো?'

'না। তা পারি না।'

'তবে তোমাকে মিথ্যা বলতে শিখতে হবে।' বললে স্বামীজি, 'একটা পশুর মত বা কাষ্ঠলোষ্ট্রের মত জড়বৎ জীবন যাপন করার চেয়ে মিথ্যে কথা বলা ভালো। তুমি অকর্মণ্য। কর্মের অতীত যে-অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্তভাব ধারণ করে, যা কিনা সর্বোচ্চ অবস্থা, তুমি তার ধারে-কাছেও নেই। তুমি এতদূর জড়প্রকৃতি যে একটা অন্যায় কাজও করতে পার না।'

কিছু একটা করো। হাতের কাছে সমূহ যে কর্তব্য আছে তাই সম্পাদন করো। তাতেই ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় হবে। ক্রমশ অগ্রসর, ক্রমশ শক্তিধর। কেউই আমরা নিঃসম্বল নই, প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো কর্ম আছে, তাই চুটিয়ে করো। তাতেই প্রসুপ্ত শক্তির বিকাশ হবে। 'ধীরে ধীরে মহাকার্য ধীরে ধীরে হয়।' বলছে স্বামীজি, 'ধীরে ধীরে বারুদের স্তর পুঁততে হয়। তারপর একদিন এককণা অগ্নি। তারপরেই সমস্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, দুই যোগ আছে, কর্মযোগ আর মনোযোগ। মনটি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে কাজটি করো।

কারু কারু ক্ষেত্রে কর্মদ্বারাই সিদ্ধি। তার কৌশল কী? সর্ব কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করো। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করো। কর্তৃত্বের 'অভিমানও দূর করে দাও। যে জীব প্রকৃতির বশীভূত সে কাঁচা-আমি, আপাত-আমি, সে মনে করে আমিই করছি, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সবই আমার, আমিই কর্তা। কিন্তু মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের উপরে যিনি আছেন তিনিই পাকা আমি, প্রকৃত আত্মা। পাকা-আমির জ্ঞানের দ্বারা কাঁচা-আমিকে দূরীভূত করো। নিজেই নিজেকে স্থির করো। তা হলেই কামনা-কলুষ থাকবে না। সকল অনর্থের অবসান হবে।

'কোনো আপোস চলবে না। আদর্শকে কার্যে পরিণত করতেই হবে।' বলছে স্বামীজি: 'ত্যাগ করো, ত্যাগ ছাড়া কোনো মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বার করতে হবে, সেই রক্তসিক্ত হৃদয় উৎসর্গ করতে হবে বেদীমূলে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। মহৎ কার্যে বিরাট মূল্য দিতে হয়—সে কী বেদনা, কী যন্ত্রণা, প্রতিটি সফলতার পিছনে কী ভয়ানক দুঃখভোগ!'

কিন্তু, উপায় নেই, এই জীবনের অভিজ্ঞতা। যদি তুমি সত্যিই পরহিত চাও, যদি সত্যিই তুমি আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ হও, বিশ্বজগৎ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু করতে পারবে না, ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যে জাগ্রত থেকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি গুঁড়ো করে দেবে।

দশ বছর কোনো আশার আলো দেখি নি। কখনো রাত নয়টার এক বেলা আহার কখনো বা ভোরে আটটায়—তাও আবার তিন দিন পরে—আর, সর্বদাই অতি সামান্য কদর্য অন্ন। ভিখিরিকে কেই বা ভালো খাবার দেয়? শুধু একবেলা আহারের জন্যে বেশির ভাগ সময় পায়ে হেঁটে তুষারশৃঙ্গ ডিঙিয়ে কখনো দশ মাইল পথ দুর্গম পর্বত চড়াই করে চলেছি। ভারতবর্ষে রুটিতে খাম্বিরা দেয়

না। কখনো কখনো এই খাম্বিরা না-দেওয়া রুটি বিশ ত্রিশ দিন ধরে সঞ্চিত রাখা হয়, তখন তা ইটের চেয়েও শক্ত হয়ে ওঠে। এই ইটের মত শক্ত রুটি চিবোতে গিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ত। নদী হতে জল এনে একটি পাত্রে ঐ রুটি ভিজিয়ে রাখতাম। মাসের পর মাস থাকতে হয়েছে এ ভাবে। তবু থামিনি, দমিনি, সমস্ত দেশ দাবড়ে বেড়িয়েছি—

সুখে-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। সুখদুঃখ লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সব সমান করে দাও। শুধু যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকাই জয়ে প্রস্তুত থাকা। সেবিতেব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ। যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে॥ যে গাছের ফল ও ছায়া আছে তারই আশ্রয় নিতে হয়। ফল যদি নাই বা পাওয়া যায়, ছায়া থেকে তো কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। সুতরাং সার কথা, বড় আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যেই কাজ করা উচিত। ফল কী জানি না, প্রচেষ্টা তো মহৎ ছিল!

কপর্দকহীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিমালয়ের চড়াই-উৎরাই ভাঙছে। সঙ্গে এক বৃদ্ধ সাধু। সে সকাতরে বললে, 'আমি আর হাঁটতে পারছি না।'

কয়েকশো মাইল দুর্গম পথ তখনো পড়ে আছে সামনে। বৃদ্ধের মুখে সকরুণ জিজ্ঞাসা: 'এই দীর্ঘপথ কী করে অতিক্রম করব?'

স্বামীজি বললে, 'আপনার পায়ের দিকে তাকান।'

কী জানি কী, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পায়ের দিকে তাকাল।

স্বামীজি বললে, 'আপনার পায়ের নিচে যে পথ পড়ে আছে তা আপনিই অতিক্রম করে এসেছেন, আর সামনে যে পথ দেখছেন সে ঐ একই পথ। সে পথও শিগগির আপনার পায়ের নিচে আসবে।'

পথে বেরিয়ে আর ফিরে যাওয়া নয়। প্রাপ্তি শুধু পথের অন্তে

নয়, পথের প্রান্তে। পথের শেষে নয় পথের আশে-পাশে। সচল হওয়াই সফল হওয়া।

'কার্য কার্য—জীবন জীবন—মতে ফতে এসে যায় কী? ফিলসফি, যোগ তপ, ঠাকুরঘর আলোচাল কলামুলো—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম—পরোপকারই এর সার্বজনীন মহাব্রত। শুধু নেগেটিভ ধর্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না—তাতে আসে যায় কী? তুমিও চুরি করো না মিথ্যে কথা বলো না, ব্যভিচার করো না, চার ঘণ্টা ধ্যান করো, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—মধু, তা কার কী?'

শুধু কাজ করে চলো। কর্মেই চিত্তের বিশুদ্ধতা। কর্মেই প্রেমের প্রসারণ। শুধু পরবর্তী ঢেউয়ের জন্যে অপেক্ষা করো। পেলেও ছেড়ো না, পাবার জন্যে ব্যস্তও হয়ো না—ভগবান স্বেচ্ছায় যা পাঠান তার জন্যে অপেক্ষা করো। কর্মেই শরণাগতি। শুধু কাজে লাগো, দূর করে দাও ইহলোক ও পরলোকের ভোগের বাসনা—আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও আর লোকদের ভগবানের দিকে নিয়ে এস।

আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। বলছে স্বামীজি, ঠাকুরঘর মন্দ নয় তবে ঐটিই সর্বস্ব করে ফেলার ঝোঁকের জন্যেই আমার ভয়। আসলে অন্তরাত্মা কাজ চায়, পায় না বলেই ঘণ্টা নেড়ে শক্তি খরচ করে। ধর্মকে কর্মমুখর করে তোলো। মুক্তির যে স্ফূর্তি তা শুধু কর্মেই মূর্তি ধরে আছে। সৎকর্মকারীর কখনো দুর্গতি হয় না—ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। বাইরে বৈফল্য এলেও অন্তরে একটি অমোঘ সন্তোষের পবিত্র স্পর্শ লেগে থাকবে, তাতেই আবার নবতর কর্মের উদ্বোধন হবে। কর্মই হচ্ছে জীবনভোর ঈশ্বরের জয়ধ্বনি।

নিয়তকর্মশীল ঈশ্বর যার চোখের সামনে, সে কী করে নিষ্ক্রিয়

হয়ে বসে থাকবে। কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। তার শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে। শুধু বসে থেকে ভোগ করবার জন্যে নয়, কাজ করতে-করতে উদ্ঘাটিত হবার জন্যে। কর্মই হচ্ছে জীবনের আনন্দিত ক্রন্দন। ক্রন্দন, কেননা জীবনের ছোট-বড় সমস্ত কাজে, বাক্যে-চিন্তায়-ব্যবহারে পরিপূর্ণ করে' পরমতমকে প্রকাশ করতে পারছি না—আর আনন্দ, কেননা এই প্রকাশের প্রয়াসেই আমি চিরপ্রেরিত, অনন্তের কাছেই আমি চিরন্তন আত্মনিবেদন করে আছি।

ফরাসিনী গায়িকা মাদাম কালভেকে বলছে স্বামীজি, আমি আমার ব্যক্তিত্বের বিনাশ চাই না, চাই না আত্মচেতনার বিলুপ্তি। লাখ লাখ বার লোকসংসারে জন্ম নিতে চাই। পৃথিবীকে নিয়ে যেতে চাই এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে, বৃহত্তর অধ্যায়ে, সর্বানন্দপ্রদাতা ঈশ্বরে।

জানো আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। আকাশবাসী ছোট্ট বারি-কণা, কিন্তু আমি আকাশেই বসবাস করব না। ঝরে পড়ব। হ্যাঁ, ঝরে পড়ব। কিন্তু সমুদ্রে নয়, যেহেতু জলে পড়ে জলে লীন হয়ে যাবার আমার ইচ্ছে নেই। না, নেই। আমি মোক্ষ চাই না, নির্বাণ চাই না, সমাপ্তি চাই না। আমি মাটিতে ঝরে পড়ব, বিশুষ্ক মলিন মাটিতে। ধুয়ে নেব এককণা ধূলি, মুছে দেব এক-বিন্দু পিপাসা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কর্ম করতে-করতেই মনের ময়লা কাটবে। আর মনের ময়লা কাটলেই তিনি দেখা দেবেন।

শুধু অভাবের তাড়নায় নয়, স্বভাবের পরিতৃপ্তির জন্যে কাজ করো। জৈবিক ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটলেও অভাব মেটে কই? কোনো পার্থিব প্রাপ্তিতেই আমাদের মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হয় না—সে আরো চায় আরো খোঁজে। কোনো এক জায়গায় সে দাঁড়িয়ে পড়তে রাজী নয়, যত বড়ই জমকালো হোক, সে তার বর্তমানের পিঞ্জরে

বন্দী থাকতে চায় না, যা সে হয়ে ওঠেনি তাই হতে পারার জন্যে সে আবার প্রসারিত হয়। কর্মই তার সেই প্রসার-শাখা, প্রসার-স্রোত। সেই স্রোতই তার অনেক দুঃখ ও শোক গ্লানি ও বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই স্রোতই তাকে শক্তিতে বীর্যে মহানন্দময় জীবন-উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত করে।

'এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস কাটে
যতই দু হাত ভরে ওঠে ধনে
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে।
যদি আলস ভরে আমি বসি পথের পরে
ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে
যেন সকল পথই আছে বাকি সে কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥'

'অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ির ইঞ্জিন, তারাও জড়—চলে ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়।' বলছে স্বামীজি, 'কিন্তু ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণু, রেলের গাড়ির পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সরে গেল, ও চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নেই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করতে চায় না। কীট নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা তাই তিনি সর্বোচ্চ।'

আমি বলি বন্ধন খোলো, জীবের বন্ধন খোলো। যতদূর পার খোলো। কাদা দিয়ে কি কাদা ধোয়া যায়? বন্ধন দিয়ে কি বন্ধন কাটে? তুমি পরহিত করবে কেন? শুধু নিজের হিতের জন্যে। সমাজের জন্যে যখন নিজের সমস্ত শুভেচ্ছা বলি দিতে পারবে তখনই তুমি বুদ্ধ হবে, মুক্ত হবে। সে অনেক দূর। জগৎপ্রেম অনেক দূর। তবু বীজটিকে, চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্ন

করতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হতে পারে।

সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে ত্যাগ হবে কী? সকাম সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম। তারপর আপনা আপনি বড় আসবে। আসবে আশাহীনতা অহঙ্কারহীনতা নিষ্কাম-অনাময়।

কোনো চিন্তা নেই, বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশি জ্বলে, সাপের মাথায় ঘা লাগলেই তবে সে ফণা ধরে। বলছে স্বামীজি, যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে, তখনই এ মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য থেকে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনো না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদলেই চোখ সাফ হয়, অন্তর্দৃষ্টি খোলে, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, এক হাতে কাজ করো আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। যখন কাজ ফুরোবে তখন দুহাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

স্বামীজিরও সেই কথা: কে তোমার সহগামী হল বা না হল তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিও না। শুধু প্রভুর হাত ধরে থাকতে যেন কখনো ভুল না হয়।

কিন্তু শুধু কর্মযোগের ঔদ্ধত্যে কী হবে? হবে না। কৃপা আকর্ষণ করতে হবে। 'মামনুস্মর, যুধ্য চ।' শুধু স্মরণমননেই হবে না, যুদ্ধ চাই। শুধু যুদ্ধেই হবে না, ভগবদনুগ্রহ চাই। একা অর্জুনে হবে না, কৃষ্ণকে চাই। একা কৃষ্ণে হবে না, অর্জুনকে দরকার।

দৃঢ়ধন্বা অর্জুন আর যোগেশ্বর কৃষ্ণ। তারই যোগফল শ্রী ও অভ্যুদয়।

আমার চোখ সুস্থ, পূর্ণদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, স্নায়ু-শিরা নিটুট নিখুঁত, কিন্তু আমি চোখ মেললেই কি দেখতে পাবো যদি আলোটি না জ্বলে? চোখের তো আলো করবার আলো জ্বালবার ক্ষমতা নেই। চোখ মেল আর প্রার্থনা করো, হে আলোকময়, আলোটি দাও, আলোটি জ্বালো। এমন যেন না হয় যে আলো জ্বলেছিল আমি চোখ মেলিনি। আমার বাহুতে বল আছে, আমার ক্ষেত্র আছে, লাঙল-গরু আছে, আমি চাষ করব। কিন্তু জল আমাকে কে দেয়? আমার কর্ষণেই তো বর্ষণ নেই। চাষ করো আর প্রার্থনা-পরিপূর্ণ হয়ে থাকো, হে বারিবাহ, হে পর্জন্যদেব, জল দাও, জল ঢালো। এমন যেন না হয় যে জল ঝরেছিল আর আমি চাষ করে রাখিনি।

কৃপাকে কে আকর্ষণ করবে? যে ক্লান্ত হয়েছে, সে করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যে ছেলে রোয়াকে বসে থাকে তাকে তার মা ধরে না, বলে, এ আমার ভালো ছেলে, ঠাণ্ডা ছেলে, রোগা ছেলে, একগলা মাদুলি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। সে বসে আছে, তার ভাগ্য বসে আছে তার ভগবানও বসে আছেন। কিন্তু যে ছেলে ছুটোছুটি করছে, যার দম বেরিয়ে গিয়েছে, সারা গায়ে ধুলো বালি কাদা মেখেছে, তাকে তার মা এসে ধরবে। ধরে মা তার স্নেহ-বিস্তীর্ণ মার্জনামধুর অঞ্চলে ছেলের স্বেদক্লেদ মুছে দেবে। যদি মার হাতের সেই স্নেহস্পর্শ পেতে চাও তো ক্লান্ত হও। ক্লিষ্ট হও।

ক্লৈব্য নয় ক্লান্তি। বিরতি নয় নিয়ত উত্থতি।

ছেলেবেলায় বাবা বিশ্বনাথ দত্ত যখন নরেন্দ্রনাথকে জিগগেস করেছিল, হ্যাঁরে বিলে, বড় হয়ে তুই কী হবি? নরেন বলেছিল, বড় হয়ে আমি কোচোয়ান হব, দুই ঘোড়ার গাড়ি চালাব। এক ঘোড়ার নাম ধর্ম আরেক ঘোড়ার নাম কর্ম। এক ঘোড়ার নাম

অর্জুন আরেক ঘোড়ার নাম কৃষ্ণ। এক ঘোড়ার নাম ক্লান্তি আরেক ঘোড়ার নাম কৃপা।

ক্লান্ত হবার উপায় কী? কর্ম—আমৃত্যু কর্ম।

'এই তো জীবন, শুধু খেটে মরো আর খেটে মরো। আর তা ছাড়া কীই বা আমাদের করবার আছে? শুধু খেটে মরো—খেটে মরো। শরীর তো যাবেই, কুড়েমিতে যায় কেন? মর্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভালো। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেলকি খেলবে তার ভাবনা কী! দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—এর কমে নেশাই হবে না। তাল ঠুকে লেগে যাও—ওয়া গুরুকী ফতে।'

আত্মানং সততং রক্ষেৎ। বলরাম বসুকে লিখছে স্বামীজি: ভববৎকৃপায় সব হয় ঠিক বটে কিন্তু যে উদ্যমী ভগবান তাকেই দয়া করেন।

পরের কৃপা চাও, নিজেকে আগে কৃপা করো। নিজের শরীরকে কর্মক্ষম রাখো, দৃঢ়তায় ও পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করো। অপ্রমেয় মহাবাহু হও। অব্যাহতবলবিগ্রহ। তা নইলে আলস্যে স্তূপীভূত হয়ে থাকবে, সে নীরন্ধ্র আত্মঘাত। স্বামীজি বলছে, আত্মঘাতীর গতি ভগবানও করতে পারেন না।

গীতায় অর্জুনের শেষ কথা কী? করিষ্যে বচনং তব। তোমার কথামত কাজ করব।

যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও। যে শির ডার দিতে পারে সেই সর্দার হতে পারে।

'শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' আগে শ্রদ্ধাকে স্বীকার করো, হৃদয়ে এনে বসাও, তবেই না কর্মে প্রবুদ্ধ হবে। দৃঢ় বিশ্বাস আর প্রীতি—তারই নাম শ্রদ্ধা। কেউ তোমাকে ডাকেনি, তুমি নিজের থেকেই স্কুলে ঢুকেছ। সুতরাং স্বীকার করে এসেছ শিক্ষক তোমার চেয়ে বেশি জানে, তুমি শিক্ষকের কথার বাধ্য হবে। এই

বিনম্র বশবর্তিতাই শ্রদ্ধা। তুমি যখন খেলতে নেমেছ তখন এ স্বীকার করে এসেছ যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত তুমি মেনে নেবে। রাস্তায় যখন নেমেছ গাড়ি নিয়ে স্বীকার করে নিয়েছ বাঁয়ে থাকবে। রাস্তার আইনকে মেনে চলবে। তেমনি নচিকেতা যখন যমালয়ে যাত্রা করল, শ্রদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে গেল—আত্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা যম ছাড়া কেউ নয়। সে যা বলে তাই মানব। শ্রদ্ধাই বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র। শ্রদ্ধাই সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্তা। যে শ্রদ্ধাহীন সেই অজ্ঞ, সেই নাস্তিক সেই সর্বস্বান্ত।

আত্মশ্রদ্ধাই আত্মবিদ্যা—পরাবিদ্যা। আবরণ বাধা উন্মোচনই সাধন। কর্মযোগে সেই উন্মোচন ত্বরান্বিত করো। হে অঙ্গার, কর্মযোগে হীরক হয়ে ওঠ। হে মলিন মাটি, কর্মযোগে পবিত্র বারি-বিতরণের কলসী হয়ে ওঠো। নিজের ঔজ্জ্বল্যে নিজে পরিচিত হও। স্বস্বরূপে বিশ্বাসী হও। তুমি সমর্থ তুমি কৃতার্থ তুমি পরিপূর্ণ। তুমি দুর্বল নও দীনহীন নও, তুমি অকল্মষ তুমি অপাপবিদ্ধ, তুমি জ্যোতির তনয়, বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির পুত্র।

আমি ভয়ের মহাভয়। 'এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী। আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি॥' আমিই একমাত্র সত্তা, অচ্ছিদ্র সত্তা—আমিই সমস্ত কিছু। আমিই সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম, আমি চিরসুখী চিরপবিত্র চিরসুন্দর। আমিই অনন্ত নীলাকাশ।

'আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করবে মনন করবে নিদিধ্যাসন করবে।' হাত যখন কাজ করবে মন যেন তখন জপ করতে থাকে, আমিই ব্রহ্ম, আমিই অশেষ, আমিই অনন্তের আয়তন।

আমার সমস্ত জল্পনা তোমার নামজপ, আমার সমস্ত শিল্পকর্ম তোমার মুদ্রারচনা, আমার ভ্রমণ তোমাকে প্রদক্ষিণ, আমার ভোজন তোমাকে আহুতিদান, আমার শয়ন তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম—আমার সমস্ত কর্ম সমস্ত চেষ্টা তোমারই পূজাবিধি।

আমি নিজেই যদি ঈশ্বর, তবে কার কাছে কৃপা প্রার্থনা করব? ঈশ্বর যেমন আমার মধ্যে, তেমনি আবার বাইরেও। আমার মধ্যে তিনি পুরুষকার, বাইরে তিনি কৃপা। বাইরের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, কৃপা করে আমার পুরুষকারকে জাগ্রত করো। আবার পুরুষকারকে জাগাতে পারলেই কৃপা আসবে। পুরুষকার-হীনের পক্ষে কৃপার প্রত্যাশা অলীক। তাই পুরুষকার আর দৈব দুইই চাই। কর্ম আর প্রার্থনা দুইয়েরই দরকার। যোগ আর যুদ্ধ। মাম্ অনুস্মর, যুধ্য চ।

৩

বিবেকানন্দ ও সাম্যবাদ

যত মত তত পথ।

কথাটার মধ্যে দেখাই যাচ্ছে, যুক্ত-অক্ষর দূরের কথা, একটা আকার-ইকার পর্যন্ত নেই। বানানে-উচ্চারণে এর মত সহজ-সরল আর কী হতে পারে। যত মত তত পথ।

অনন্ত মত অনন্ত পথ। মতে-পথে নানা বৈষম্য, নানা বিরোধ। কিন্তু সমস্ত রাস্তাই চলেছে 'রোমে'র দিকে—এক গন্তব্যে। আশ্চর্য, ঋজু কুটিল এত বিচিত্র নদী, কিন্তু মিশতে চলেছে এক সমুদ্রে, এক অগাধে। এত অনৈক্যের মধ্যে কোথাও তা হলে এক আছে, পূর্ণ আছে, সমগ্র আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি কাঠের সিঁড়ি মই-দড়ি, আবার আছোলা বাঁশ বেয়েও উঠতে পারো। এক কালীঘাটে আসতে হলে কেউ নৌকোয় কেউ গাড়িতে কেউ বা সটান পায়ে হেঁটে চলে আসে। ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই নানা ধর্ম নানা পথ হয়েছে। যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। কোনো ছেলের জন্যে ভাত, কারু জন্যে লুচি, কারু জন্যে খই-বাতাসা ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থা বহু, কিন্তু তিনি এক। বাড়িতে একজনই সেই বাবু আছেন, কেউ ডাকছে খুড়োমশাই, কেউ মামাবাবু, কেউ মেসোমশাই। ডাক আলাদা কিন্তু ব্যক্তি সেই এক বই দুই নয়। এক রাম তার হাজার নাম। সকলেরই একে লক্ষ্য, কিন্তু পাত্র আলাদা পথ আলাদা পদ্ধতি আলাদা। আমাকে সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু মুসলমান খৃস্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত—এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর, সবাই আসছে তাঁর কাছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।'

স্বামীজি বলছে, এই বিভিন্নতা এই বিচিত্রতা থাকবেই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে থেকে যাবে এক সুমহান ঐক্য। তাই সাম্য জীবত্বে নয় সাম্য দেবত্বে। বিবেকানন্দের সাম্য জীবসাম্য নয় শিবসাম্য।

নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কেই তো শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি: আর সকলে ঘটিবাটি, নরেন জালা। আর সকলে পোনা কাঠি বাটা, নরেন রাঙাচক্ষু রুই। আর সকলে ডোবা পুষ্করিণী, নরেন বড় দিঘি, যেন হালদার-পুকুর। পদ্মমধ্যে সহস্রদল। আমরা সকলে নর আর ও নরের মধ্যে ইন্দ্র।

তবে শক্তির তারতম্য তো আছেই। প্রকাশের তারতম্য। কোনোখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনোখানে একটা মশাল। সূর্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশি প্রকাশ। আবার জলের চেয়ে আর্শিতে বেশি প্রকাশ।

তারতম্য থাকবেই। তা না হলে সৃষ্টিতে আনন্দ কী। নরেনে-কেশবে শক্তিতে পার্থক্য আছে, কিন্তু নরেনও যে ঈশ্বর কেশবও সেই ঈশ্বর।

শুধু নরেন-কেশব কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ডাকাতরূপী নারায়ণ লম্পটরূপী নারায়ণ, ছলরূপী নারায়ণ, খলরূপী নারায়ণ। স্বামীজি বলেছে, প্রত্যেক জীবই সেই সর্ববৃহৎ মহতো মহীয়ান ঈশ্বরের মন্দির। সাম্য জীবভূমিতে নয়, সাম্য দেবভূমিতে।

'পূর্ণ সাম্য আর পূর্ণ বিলয় একই কথা'—বলছে স্বামীজি। 'জগতে বৈষম্য-উৎপাদিকা শক্তি যদি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে জগৎই লোপ পায়। বৈষম্য ও বৈচিত্র্যই দৃশ্যমান জগতের কারণ। একীকরণ বা সমতা দৃশ্যমান জগৎকে এক নিশ্চিদ্র প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করে। মানুষ এ অবস্থা মেনে নিতে কখনো সম্মত নয়। জড়দেহে ও সামাজিক শ্রেণীবিভাগে সম্পূর্ণ সমতা স্বাভাবিক মৃত্যু আনে এবং সমাজের বিলোপ ঘটায়। চিন্তা ও

অনুভূতির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমতা মননশক্তির অপচয় ও অবনতি ঘটায়। সুতরাং সম্পূর্ণ সমতা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।'

সম্পূর্ণ সমতা একটা অবাস্তব কাহিনী। খাদ্যের সমতা ঘটালেও ক্ষুধার সমতা ঘটবে না, না বা রুচির সমতা, না বা পরিপাক-শক্তির। রসবোধের ক্ষমতাও লোকে-লোকে ভিন্ন। রূপে গুণে শক্তিতে চরিত্রে মেধায় বিদ্যায় বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। বৈচিত্র্যই জীবনের সারবস্তু। আমি একঘেয়ে কেন হব? শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। আমি মাছকে ঝালে ঝোলে অম্বলে ভাজায় বিচিত্র ব্যঞ্জনে আস্বাদ করব। যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিতে প্রাণের ক্রিয়া চলবে ততদিন পর্যন্ত চলবে বিচিত্রতা, ততদিন সর্বভেদের বিলয় ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় সাম্যাবস্থা অসম্ভব।

'কিন্তু তাই বলে তুমি ক্ষমতাধিক্যের বলে দুর্বলকে নিপীড়িত করবে, পদদলিত করবে, তার মানবিক অগ্রাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবে,' স্বামীজি জিগগেস করছে, 'এটা কোন নীতি? তুমি কি দেখছ না এত বিস্তৃত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তুমি আর সে একসত্তা, এক মহিমময় সত্তা, এক ঈশ্বর? তা হলে তুমি কী করে অন্যকে শোষণ করো, পীড়ন করো, তার দুঃখে-দারিদ্র্যে-উদাসীন থাকো?'

'সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ।' কিডিকে চিঠি লিখছে স্বামীজি: 'প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘেঢাকা সূর্যের মত। একজনের সঙ্গে আরেকজনের তফাত এই—কোথাও সূর্যের উপর মেঘের আবরণ ঘন, কোথাও এই আবরণ একটু পাতলা। সূর্য কোথাও স্ফুট কোথাও অস্ফুট। বিভিন্ন উপাধির মধ্যে সেই একের—এক আত্মারই প্রকাশ, এক আত্মারই পরিচয়। তুমিও যে সেও সে। তাই প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঈশ্বর বলে চিন্তা করা ও প্রত্যেকের সঙ্গে ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত। যদি মানুষকে ঈশ্বর বলেই ভাবা যায় তবে ঘৃণানিন্দা লুণ্ঠনপীড়ন থাকে না, থাকে না বিন্দুমাত্র অনিষ্টচেষ্টা।'

বৈচিত্র্য থাকবে, জীবনের প্রয়োজনে থাকবে, থাকবে বৈষম্য, কিন্তু তার উর্ধ্বে যে একত্ব আছে সেই একত্বে মানুষের মহামিলন ঘটাতে হবে। তা হলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত হবে। যদি এ কথা ভাবতে পারা যায়, বিশ্বাস করতে পারা যায় যে সবাই আমরা ঈশ্বর, তা হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে প্রেম আসে। জীবে দয়া? না। কী সাধ্য তোর, তুই দয়া করবি? তুই কি উঁচুতে দাঁড়িয়ে? আর ও নিচে? কখনো না। দুজনেই সমতলভূমিতে, ব্রহ্মভূমিতে দাঁড়িয়ে। জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা। সেবা বলেও ঠিক ভাবটা প্রকাশ করা যায় না। জীবে পূজা। জীবে প্রেম। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে—না, পূজিছে ঈশ্বর।' বৃহতের প্রতি প্রেম জাগলে তুচ্ছ তোমার ক্ষুদ্র-আমির সুখদুঃখ, ক্ষুদ্র-আমির লাভলোকসান।

ঠাকুরের অসুখ, নানা জনে নানা কথা কইছে।

রামদত্ত বলছে, 'এ অসুখ না হলে ঠাকুরকে চিনত কে? সুস্থ শরীরে সবাই ভগবানে মন রাখতে পারে কিন্তু এই দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে যিনি সর্বক্ষণ ঈশ্বরের অনুধ্যানে থাকতে পারেন তিনিই অবতার।'

বলরাম বললে, 'ঠাকুরের কখনো অসুখ করতে পারে? এ আমাদের অসুখ, আমাদের পাপ।'

শশী বললে, 'জগতের দুঃখ দেখে যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগ ভোগ করছেন।'

'অত কথায় কাজ কী! শুধু সেবা, সেবা লাগিয়ে দে।' বলে উঠল নরেন, 'দেখছিস না আমাদের সেবা নেবেন তাই তাঁর এ অসুখ। সেবাই যে পূজা, সেবাই যে শিব, তাই শেখাবার জন্যে এই আয়োজন।'

কাশীপুরের বাড়িতে তখন অন্য পূজা-অর্চনা বন্ধ।

কে একজন এসে নালিশ করলে, 'সারাদিন কেবল রুগীর সেবাই করেন, জপধ্যান উপাসনা আরাধনা কিছুই করেন না?'

'সেবাই আমাদের একমাত্র উপাসনা, একমাত্র আরতি।' বললে নরেন, 'এ ছাড়া আমাদের আর কোনো পূজা-চর্যা নেই। যাকে শুশ্রূষা করছি, নাওয়াচ্ছি-খাওয়াচ্ছি, যার পা টিপে দিচ্ছি, মলমূত্র পরিষ্কার করছি, সেই আমাদের ইষ্ট, সেই আমাদের ভগবান।'

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। এই জগতে গতি সম্ভব হচ্ছে কিসের থেকে? সমতাচ্যুতি থেকে। যখন এই জগৎ ধ্বংস হবে তখনই সাম্য-ঐক্য আসতে পারে। তার আগে নয়। বলছে স্বামীজি। আমরা সকলেই একরকম চিন্তা করব এরূপ ইচ্ছে করাও উচিত নয়। তা হলে চিন্তা করবারই কিছু থাকবে না। তখন যাদুঘরের মিশরীয় মামিগুলির মত আমরা সকলে এক রকমের হয়ে যাব আর পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে থাকব— আমাদের মনে ভাববার মত কথাই উঠবে না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস। আমাদের সকল মনন-চিন্তনের প্রসূতি।

তবে আমরা এক কোথায়? আমরা সত্তায় এক—সেই সত্তাই ঈশ্বর। আমরা অহং-এ বিচ্ছিন্ন, আত্মায় এক। বিবেকানন্দের সাম্যবাদ জীবনের মানকে নামিয়ে এনে নয়, জীবনের মানকে উর্ধ্বে তুলে ঈশ্বরে বেদান্তে সাম্যবাদ।

তাই বলে কি সংগ্রাম নেই? সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল?

না, ঘোরতর সংগ্রাম। বঞ্চনা-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করবার জন্যে সংগ্রাম। তারপর মানুষকে ঈশ্বর করে তোলবার সংগ্রাম।

কী বলছে স্বামীজি?

বলছে, 'এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোকের চেয়ে

স্বভাবতই বেশি বুদ্ধিমান—এ আমাদের সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের সুযোগ নিয়ে এই শ্রেণীর লোক অল্পবুদ্ধি লোকদের থেকে তাদের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও কেড়ে নেবে কিনা। এই পীড়নকে রোধ করবার জন্যে সংগ্রাম। কেউ কেউ আর কারু চেয়ে বেশি বলশালী হবে, এ তো স্বাভাবিক, কিন্তু তার জন্যে দুর্বলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যটুকুও নিজেদের জন্যে কেড়ে নেবে—এই অধিকারবোধ নীতিসম্মত নয়, আর সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবেই চলবে। এক দল লোক আরেক দলের থেকে বেশি ধনসঞ্চয় করবে এ আশ্চর্য কী, কিন্তু ধনসঞ্চয়ের সামর্থ্য-হেতু তারা অসমর্থদের উপর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন করবে এ নীতিসম্মত নয়, আর সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনিবার্য। নীতিধর্মের লক্ষ্যই এই বিশেষ অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। ততঃ কিম? লুণ্ঠন-পীড়ন বন্ধ হল, বিশেষ অধিকারবাদ থাকল না—তারপর কী হল? কাজ শেষ হল? না, আসল কাজই এখনো বাকি। মানুষকে এখনো ঈশ্বর করা হয়নি।

বৈচিত্র্য ও পার্থক্য অনন্তকাল বিরাজ করুক। বলছে স্বামীজি, তুমি আমার চেয়ে বেশি ধনী, তুমি আমার চেয়ে বেশি বলবান, তুমি আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান, তুমি আমার চেয়ে বেশি অধ্যাত্মপ্রবণ—হলেই বা। তাতে কী এসে যায়? আমাকে আমার সাধ্যমত স্বাধীনমতই থাকতে দাও। তুমি আমার চেয়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে বেশি বলবান বলে আমার চেয়ে বেশি অধিকার ভোগ করবে তা হতে পারে না। আমার চেয়ে তোমার বেশি ধনদৌলৎ আছে বলে তুমি আমার চেয়ে বড় বলে কুলীন বলে বিবেচিত হবে এ হতে পারে না। কেননা অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের সেই একই সমতা। সোঽহং আর তত্ত্বমসি।

আমেরিকাকে বলছে, 'কী কতগুলি মিশনারি পাঠাচ্ছ আমাদের

দেশে? আমাদের দেশকে তোমরা কী ধর্ম শেখাবে? আমাদের দারিদ্র্যমোচনের জন্যে বরং যন্ত্রপাতি পাঠাও। কল-কারখানা বানাতে শেখাও। জাতিভেদের কথা তোমরা বলতে এস না। নিগ্রোদের সম্পর্কে তোমাদের যা ব্যবহার তা এককথায় পৈশাচিক। আমাদের এখন প্রধান কাজ দরিদ্র জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধকে জাগিয়ে তোলা। ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল জনসাধারণের দারিদ্র্য। এর নিরসন না হলে ভারতবর্ষ ধর্মে-কর্মে জ্যোতির্ময় হবে কী করে? তারাই যথার্থ জীবিত যারা অন্যের জন্যে জীবনধারণ করে। তুমিও এই দারিদ্র্য দূর করবার জন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আর দরিদ্রকে ডেকে বলো, তুমি দরিদ্র বলেই অশ্রদ্ধেয় নও, অপাঙ্‌ক্তেয় নও। তুমি মেঘে ঢাকা সূর্য, কোশে ঢাকা ক্ষুর, ধুলোর মধ্যে পড়ে থাকা অম্লান হীরকখণ্ড। তুমিই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। তুমিই শুদ্ধ শাশ্বত অটল অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্ম।'

তীর্থ করতে বেরিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্যনাথধামে নেমেছেন। কোথায় বৈদ্যনাথ? শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ পড়ল অনাথ-দরিদ্রদের দিকে। পরনে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই একফোঁটা। জীবনে কোনোদিন হেসেছে তার লক্ষণ লেখা নেই মুখে-চোখে।

মথুরবাবুকে ধরলেন। বললেন, 'তুমি তো মার দেওয়ান। এদেরকে একমাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও। আর একদিন খাইয়ে দাও পেট ভরে।'

মথুরবাবু আপত্তি করলেন। বললেন, 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে। এতগুলি লোক খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার টানাটানি পড়ে যাবে, সামলাতে পারব না।'

ঠাকুর মথুরবাবুকে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন: 'দূর শালা। তোর তীর্থ তুই একলা কর, একলা যা। আমি এদের কাছেই থাকব। এদের ছেড়ে আমি আর যাব না কোনোখানে।'

সেই অটল প্রতিজ্ঞার কাছে নত হলেন মথুরবাবু। কলকাতা থেকে কাপড় আনালেন, স্থানীয় বাজার থেকে তেল কেনালেন। দরিদ্র-আতুরদের মধ্যে বিতরণ করলেন মুক্তহাতে। মহাপ্রসাদের ভোগ লাগিয়ে দিলেন একদিন।

লোকগুলির আনন্দ দেখে কে ? তাদের আনন্দেই শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দ। যদি তুমি দারিদ্র্যমোচন না করো তবে তুমি কিসের বৈদ্যনাথ ?

'দেশের লোক খেতে-পরতে পাচ্ছে না—আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি ?' বলছে স্বামীজি : 'ওদেশে যখন গিয়েছিলুম, মাকে কত বললুম, মা, এখানে লোক সুখের বিছানায় শুচ্ছে, চর্বচূষ্য খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে ! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। মা, তাদের কোনো উপায় হবে না ? ওদেশে কি আমি শুধু ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলাম ? আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল, যদি এদেশের লোকের জন্যে অন্ন-সংস্থান করতে পারি।'

মঠের জঙ্গল সাফ করতে ও মাটি কাটতে কতগুলি সাঁওতাল-মজুর নিযুক্ত হয়েছে। তাদের একজনের নাম কেষ্টা। সব কাজ ফেলে স্বামীজি তার সঙ্গে গল্পে মেতেছেন। কথা বলতে-বলতে কেষ্টা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'ওরে স্বামী, বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানে আসিস না। তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে বুড়ো বাবা এসে বকে।'

স্বামী অদ্বৈতানন্দকে বুড়ো বাবা বলছে।

স্বামীজির চোখ ছলছল করে উঠল, বললে, 'না, না, বুড়ো বাবা বকবে না। তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল।'

একটা গরিব মজুরের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথাই বুঝি ঈশ্বরকথা।

স্বামীজি হঠাৎ বললে, 'ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি ?'

'আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না।' বললে কেষ্টা একটি সলজ্জ হাসির রেখা টেনে। 'এখন যে বিয়ে হয়েছে। তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবে রে বাপ।'

'বা, নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবে—তা হলে তো খাবি?'

'তা হলে খেতে পারি।'

মঠ থেকে লুচি তরকারি দই মিষ্টি প্রচুর আনা হল কেষ্টা ও তার সঙ্গীদের জন্যে। কাছে বসিয়ে খাওয়াতে লাগল স্বামীজি।

খেতে-খেতে তৃপ্তিভরা স্বরে কেষ্টা বললে, 'হ্যাঁ রে স্বামী, বাপ, তোরা এমন জিনিসটা কুথা পেলি? হামরা এমনটা কখনো খাইনি।'

'তোরা যে আমার নারায়ণ।' বললে স্বামীজি, 'আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।'

'কী শিখিয়েছেন আমাদের বিবেকানন্দ?' ডক্টর গ্রসম্যান বক্তৃতা দিচ্ছেন: 'শিখিয়েছেন ধর্ম শুধু চিন্তা নয়, ধর্ম কর্ম, জীবন্ত কর্ম। আমাদের ভাব আছে কিন্তু ভাবের রক্তমাংস যে কর্ম সেই কর্ম নেই। আমরা ভ্রাতৃত্বের কথা বলি কিন্তু প্রাচ্যদেশের লোক এলে তাকে প্রত্যক্ষ অপমান করতে পেছপা হই না। আমাদের ঈশ্বর আকাশে কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর মাটিতে। আমাদের ঈশ্বর সিংহাসনে বসে আছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর চাষ করছেন, মাটি কাটছেন, পাথর ভাঙছেন, ধুলো পায়ে হাঁটছেন মেঠো পথ ধরে।'

> 'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ
> পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
> রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
> ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
> তাঁরই মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধূলার 'পরে॥'

'দেশের লোক দু মুঠো খেতে পায় না দেখে এক-এক সময় মনে হয় ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া, নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা। সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

তোরা কী করলি বল দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিয়ে দিতে পারলিনে? আবার জন্মে এসে বেদান্ত-ফেদান্ত পড়িস। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা। গেরুয়া পরে তবে আর কী হল? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণের নামই যথার্থ সন্ন্যাস। ইচ্ছে হয় মঠ-ফঠ সব বিক্রি করে দিই। এইসব গরীব দুঃখী দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে দিই। আমরা তো গাছতলা সার করেছি।'

দরিদ্রনারায়ণ! সম্প্রতি এই কথাটার উপর কেউ-কেউ কটাক্ষ করছে। যেন বলা হচ্ছে, হে দরিদ্র, তুমি দরিদ্রই থাকো, যাতে তোমাকে আমরা চিরকাল নারায়ণজ্ঞানে সেবা করে কৃতার্থ হতে পারি। যদি দারিদ্র্য চলে যায় তবে আমাদের নারায়ণপুজো হবে কী করে?

যাদের চিত্তে দারিদ্র্য এ-কটাক্ষ তাদেরই। দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা হবে এ আদর্শে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে প্রবুদ্ধ-প্রেরিত। কিন্তু একদিন বিত্তের দারিদ্র্য দূর হয়ে গেলেও চিত্তের দারিদ্র্য দূর হবে না। অন্তত তাদের হবে না মানুষকে যারা শুধু শরীর মনে করে, যন্ত্রাধীন মনে করে, মনে করে একস্তূপ অভ্যাসের পুঁটলি। তখন আবার সেই সব চিত্তদরিদ্রদের সেবা করব আমরা, বলব, হে মানুষ, তুমি শুধু দেহ নও, যন্ত্র নও, ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার নও, তুমি ক্ষুদ্র বদ্ধ নও, তুমি বিরাট তুমি স্বরাট তুমি আত্মা তুমিই ঈশ্বর। তখন এইভাবেই দরিদ্রনারায়ণের সেবা হবে। তখন আবার বলা হবে তুমি আপন মহিমা থেকে কেন বঞ্চিত হয়ে

থাকবে। তুমিই সেই তেজোময় অমৃতপুরুষ, তুমিই জীবনের মৃত্যুঞ্জয় শঙ্খধ্বনি।

'যদি ভালো চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো করোগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ।' বলছে বিবেকানন্দ, 'ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—এ পাগলা গারদ, দেশ নয়। তোরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার কর। এই চিরপতিত দরিদ্ররা তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক ইষ্ট হোক। তাদেরই আমি মহাত্মা বলি যাদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্যে রক্তক্ষরণ হয়—তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্যে আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রচেষ্টা, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক।'

'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সকলে তাঁর অবতার। তুমি নতুন লীলা কী দেখাবে, তাঁর নিত্য লীলা চমৎকার।'

'আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি,' বলছে স্বামীজি, 'জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন। তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছু নেই।'

তাই এ বলা ঠিক হবে না যে বিশুদ্ধ মানবিকতাই বিবেকানন্দ-দর্শনের সার কথা। বলা উচিত ঐশ্বরিকতাই বিবেকানন্দ-দর্শনের

সার কথা। সে যে মুক্তি খুঁজেছে তা শুধু দারিদ্র্যের থেকে পীড়নের থেকে বঞ্চনার থেকে মুক্তি নয়, এ মুক্তির চেয়েও আরো এক বড় মুক্তি আছে যার অর্থ হচ্ছে উন্মোচন। তোমার প্রচ্ছন্নকে প্রস্ফুট করে প্রকাশিত হওয়া—প্রকাশিত হয়ে প্রমাণিত হওয়া যে আমাদের প্রকৃত সত্তাই ঈশ্বরত্ব। আদিম পাপ নয় আদিম পবিত্রতা। কাকে তুমি পাপী বলছ? ও আসলে হীরে, শুধু ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। ওর গা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে দাও, ও আবার হীরে, প্রথম থেকেই হীরে।

শ্রেণীহীন সমাজ শুধু অমৃতত্বে, সত্তার পরিপূর্ণ উদ্ঘাটনে, ঈশ্বরায়ণে, সেইখানেই মানবভ্রাতৃত্ব সম্ভব। শুধু মানবভ্রাতৃত্ব নয়, তার চেয়েও বড় জিনিস, ব্রহ্মৈকাত্মতা।

আধ্যাত্মিক সত্যের অসীম সমুদ্র আমাদের সামনে প্রসারিত। সেই সমুদ্রে স্নান করে আমরা সোঽহং বলে চিনব নিজেদের। আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হতে হবে। সেই পূর্ণতাতেই আমাদের সমতা—এর কমে নয়, এর নিচে নয়, এর বিকল্পে নয়।

শুধু আমি নই, তুমিও ঈশ্বর। আর, সকল মানুষে এই ঈশ্বর-দর্শনই পরম সুখ।

আগ্রা থেকে বৃন্দাবনে চলেছে স্বামীজি। বসনে গ্রন্থি নেই কানাকড়িও সম্বল নেই। চলেছে পায়ে হেঁটে। ভারতবর্ষের মাটি মমতায় স্পর্শ করে করে।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। কোথাও বিশ্রাম নেই, নেই ছায়াঘন শ্যামকুঞ্জ। তবু দুর্বিষহ দাবদাহের মধ্য দিয়েই পথ করে নেব।

কিছুদূর এগিয়ে দেখতে পেল পথের ধারে গাছতলায় বসে কে একটা লোক তামাক খাচ্ছে। কী তৃপ্তি চোখে মুখে!

স্বামীজি থামল। মনে হল যদি কলকেটা তুলে তাতে একটা টান দিতে পারে তা হলে এই ক্লান্তির অপনোদন হয়।

কাছে এসে হাত বাড়ালে, বললে, 'ভাই, তোমার কলকেটা একটু দেবে? একটা টান দিই?'

সে লোক মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাল স্বামীজির দিকে। কে এই প্রদীপ্ত পুরুষ!

অপরাধীর মত মুখ করে লোকটা বললে, 'মহারাজ, আমি ভাঙ্গি, আমি মেথর। আমার মুখের কলকে তোমাকে কী করে দেব?'

প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিল স্বামীজি। সত্যিই তো, মেথরের উচ্ছিষ্ট কলকে কী করে মুখে দিই?

এগিয়ে চলল স্বামীজি। কতদূর যেতেই তার মনে ডাক দিল: এই আমার সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন? আমি কাকে ঘৃণা করলাম? কাকে ছোট বলে পরিহার করলাম? আমি তাকে ছোট দেখলাম বলেই সে আসলে ছোট নয়। আমার চোখে যদি ন্যাবা লেগে থাকে আমি জিনিস হলদে দেখব কিন্তু সূর্য ঠিকই আছে। শুধু আমার দেখবার ভুল। আর এই ভুলের জন্যেই যত দুঃখ ও গ্লানি।

ফের সেই গাছতলায় ফিরে এল স্বামীজি। সেই পথাশ্রয়ী লোকটার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। বললে, 'ভাই, আমাকে শিগগির এক ছিলিম তামাক সেজে দাও।'

কুণ্ঠিত সংকুচিত হয়ে লোকটা বললে, 'মহারাজ আমি ভাঙ্গি, আমি মেথর।'

'কে বললে? তুমি নারায়ণ। তুমিও যে আমিও সে। দাও, দেরি কোরো না।'

'কিন্তু মহারাজ, এ বড়ো-তামাক।' লোকটা বুঝি স্বামীজিকে নিবৃত্ত করতে চাইল।

স্বামীজি বললে, 'তা হোক। তুমি কলকে ধরিয়ে দাও।'

লোকটা কলকে ধরিয়ে দিল। ভরাট কলকে অগাধ তৃপ্তিতে টানতে লাগল স্বামীজি।

তুমিও যে আমিও সে। সমান-সমান। তুমিও অমৃত আমিও অমৃত। তুমিও অভয় আমিও অভয়। সূর্যে চন্দ্রে নক্ষত্রে যে পুরুষ, যে পুরুষ বিশ্বে ব্রহ্মাণ্ডে সেই পুরুষই আমি, সেই পুরুষও তুমি।

'অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায় দেহ মোর ভেসে যায়
কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি···
ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে চাহি কহি জোড়হাতে
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার-আমার মাঝে এক।'

শুধু নিজে দেখি না, অন্যকেও দেখাই। আর এই স্বরূপকে দেখানোও পরম সেবা। যে এই স্বরূপের সন্ধান জানে না সে নারায়ণ হয়েও দরিদ্র। সেও দরিদ্র-নারায়ণ। তার উজ্জীবনেই তার সেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ছাগলের পালে বাঘ পড়ার গল্পটা মনে করো।

একটা বাঘিনী ছাগলের পালে পড়েছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে তীর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেললে। বাঘিনীর পেটে বাচ্চা ছিল তখনি সেটা প্রসব হয়ে গেল। ছানাটা প্রথমে ছাগলের মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়ে পরে দলে পড়ে ঘাস খেতে লাগল। গলার আওয়াজও বেরোল ভ্যা-ভ্যা। আবার, যদি কোনো জানোয়ার দেখে, অমনি পালায়। ছাগলদের মতই পালায়।

একদিন সেই পালে আরেকটা বাঘ এসে পড়ল। ছানাটা আর-আর ছাগলদের সঙ্গে দৌড়ে পালাল। তখন বাঘটা ছাগলদের কিছু না বলে সেই ঘাসখেকো বাঘটাকে ধরল। সে ভ্যা-ভ্যা

করতে লাগল, আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন তাকে টেনে হিঁচড়ে একটা নালার কাছে নিয়ে এসে বাঘ বললে, 'এই জলে তোর মুখ ছাখ। আমার যেমনি হাঁড়িমুখ, তোরও তেমনি।' তারপর তার মুখে খানিকটা মাংস গুঁজে দিলে। সে কোনোমতে খাবে না, কেবল ভ্যা-ভ্যা করে। শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে বেশ খেতে লাগল। তখন বাঘটা বললে, 'এখন বুঝেছিস আমিও যা তুইও তা। এখন আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।' বাঘের বাচ্চা বনে চলে গেল।

ঘাস খাওয়া কিনা কামকাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত ডাকা আর পালানো কিনা সামান্য জীবের মত আচরণ করা। জলে নিজের মুখ ঠিক দেখা কিনা স্ব-স্বরূপকে চেনা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া কিনা গুরু যিনি চৈতন্য করলেন তাঁর শরণাগত হওয়া। আর বনে যাওয়া কিনা স্বধামে প্রত্যাবর্তন করা।

তাই যেদিন তোমার দারিদ্র্যমোচন হবে, মাত্র ঘাসখেকো বাঘ হয়ে ছাগলের দলে মিশে থাকবে, তখন আবার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে যে তোমাকে তোমার হাঁড়িমুখটা দেখায়, তোমাকে তোমার স্বরূপ চেনায়, তোমাকে তোমার উপযুক্ত খাদ্য, রক্তাক্ত মাংস পৌঁছিয়ে দেয়।

তাই যতদিন মানুষ না ঈশ্বর হচ্ছে ততদিন থাকবে দরিদ্র-নারায়ণ। থাকবে সেই দরিদ্রনারায়ণের সেবা।

সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি করো, সর্বভূতেই তিনি আছেন জানো, নিজের জীবনকেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত মনে করো—জেনে রাখো এই আমাদের একমাত্র কর্তব্য একমাত্র জিজ্ঞাস্য একমাত্র আদর্শ। যখন সকল বস্তুতেই ঈশ্বর বিদ্যমান তাকে লাভ করবার জন্যে কোথায় যাব, কোন দূর দুর্গমে? প্রত্যেক কর্মে প্রত্যেক চিন্তায় তিনি পূর্ব থেকেই অবস্থিত। যীশু বলেছেন, 'স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে।' বেদান্তও তাই বলে। স্বর্গরাজ্য প্রথম থেকেই তোমার

মধ্যে বিরাজমান। শুধু ঐটুকুই নয়, সমুদয় জগৎই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। যখন বেদান্ত বলে, সংসার ত্যাগ করো, তার অর্থ, তুমি জগৎকে যেরূপ অনুমান করেছিলে সেই অনুমান ত্যাগ করো। অনন্তকাল ধরে একমাত্র ঈশ্বরই বিদ্যমান, তাঁকে দেখ। তোমার অনুমান আংশিক অনুভূতির উপর, খুব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার দুর্বলতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সংসার ত্যাগ করো অর্থ ঐ আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ করো, জগৎকে যেরূপ ভাবছিলে যেভাবে দেখছিলে—সেটা ভ্রম, স্বপ্ন, মায়া। সেই জগৎকে ত্যাগ করো। নিত্যবস্তু একমাত্র ঈশ্বরকে দেখ। সংসার ত্যাগ করবে মানে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করবে না, স্ত্রী-পুত্রে যে ভ্রান্ত দৃষ্টি ফেলে-ছিলে তা সরিয়ে নাও, তাদের মধ্যেও সেই সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে দেখ। ঈশ্বরকে দেখতে-দেখতে ঈশ্বর হয়ে যাও। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। ঈশ্বরই প্রকাণ্ডতম সুখ প্রচণ্ডতম শান্তি। বৃথা বাসনায় ইতস্তত কেন ঘুরে মরি? ঈশ্বরের কম কোনো বাসনাপূর্তিতেই তো আমার নিবৃত্তি হবে না। আর অকামো বিষ্ণুকামো বা। ঈশ্বর-কামনা কামনার মধ্যে পড়ে না। আর সেই কামনাই জীবনের মৃত্যুহীন আনন্দ।

হে সূর্য, হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করে আছ। আমি সত্যধর্মা, যাতে আমি ঠিক-ঠিক দেখতে পারি তার জন্যে এই আবরণ অপসারিত করো। সর্বত্র সেই এক পুরুষকে দেখি, অকায় অব্রণ অস্নায়ু, পবিত্র ও নিষ্পাপ—যে পুরুষ আমিই নিজে।

দেখতে দেয় না কে? জানতে দেয় না কে? ঐ আবরণ। হরিদাস বাঘের ছাল পরে সবাইকে ভয় দেখায়, সকলে বাঘ ভেবে পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে। শুধু একটা ছেলে, বীর সাহসী ছেলে বলতে পারল নির্ভয়ে: তুই তো আমাদের হরে রে। অমনি হরিদাসই ভয় পেয়ে বাঘের ছাল ফেলে পালিয়ে গেল।

'তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই,
এ সংসারে তোমার আমার মাঝখানেতে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ, অনেক ব্যবধান—
দুঃখসুখের অনেক বেড়া ধন জন মান।
আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে আভাসে দাও দেখা
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রবির মৃদু রেখা।
শক্তি যারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা ঘুচিয়ে দাও তার।
না রাখ তার ঘরের আড়াল না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন।
না থাকে তার মান অপমান লজ্জা শরম ভয়—
একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভুবনময়।
এমন করে মুখোমুখি সামনে তোমার থাকা
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ পূর্ণ করে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে তার লোভের সীমা নাই
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে তোমায় দিতে ঠাঁই।'

সেই অসীম প্রেমের ভারবাহী শক্তিমান একাকী পুরুষই স্বামী বিবেকানন্দ।

জয়পুরের রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে বিবেকানন্দ বিশ্রাম করছে, কক্ষান্তরে মহারাজার নাচের আসর বসেছে। নগরের শ্রেষ্ঠ নর্তকী বাইজী বীণা বাজিয়ে গান করছে। মহারাজা স্বামীজিকে চিরকুট পাঠাল। আসুন, গান শুনে যান, এমনটি আর শোনেননি কোনোদিন।

চিরকুটের অপর পৃষ্ঠায় উত্তর লিখে পাঠাল স্বামীজি : আমি সন্ন্যাসী, বাইজির গান শুনতে আমার অভিরুচি নেই।

কথাটা বাহিত হল গায়িকার কাছে। সে মর্মাহত হল। বুঝল যেহেতু সে পতিতা, স্বামীজি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দুঃখ

উথলে উঠল বুকের মধ্যে, হয়তো বা কণ্ঠস্বরে। বাইজী গান ধরল :

প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।

প্রভু, আমার দোষ তুমি ধোরো না। তুমি তো সমদর্শী, তুমি তো সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরপারে, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করবে? পুজোর ঘরের ফলকাটা বঁটি আর কসাইয়ের হাতের খড়্গ দুইই এক লোহায় তৈরি কিন্তু স্পর্শমণির অন্তরে দ্বিধা নেই, সে দুই লোহাকেই সোনা করে। গঙ্গায় অনেক জল পড়ে, ভালো জল মন্দ জল, নদী নালার জল, নোংরা নর্দমার জল, কিন্তু কলুষ-হারিণী গঙ্গার অন্তরে দ্বিধা নেই, সে দুই জলকেই পবিত্র করে। আমাকে যদি তুমিও নিরাশ্রয় করে রাখো তবে তুমি কিসের কী বাহাদুর?

সে গান স্বামীজির কানে ঢুকল। তক্ষুনি চমকে উঠে দাঁড়াল : 'এই, এই আমার সর্বভূতে অভেদদর্শন?'

ঠাকুর রতির মার মধ্যে কালীকে দেখেছিলেন। অভিনয়ে নটী বিনোদিনী চৈতন্য সেজেছিল। ঠাকুর তাকে আশীর্বাদ করলেন, মা, তোর চৈতন্য হোক। আর সেই আশীর্বাদের পুণ্যে সে কণ্টক-বৃক্ষ সুগন্ধানন্দ চন্দন হয়ে গেল।

ঠাকুরের যখন খুব অসুখ তখন বিনোদিনী ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসেনি তাঁকে দেখতে? একে স্ত্রীলোক তায় নটী, কোনো নিদর্শনেই তার অধিকার ছিল না ঠাকুরের ঘরে দূরের কথা, সেই বাড়িতেই প্রবেশ করে। বিনোদিনী সাহেব সাজল। প্যান্টে কোটে হ্যাটে, হাতের ছড়িতে, চালে চলনে নিখুঁত সাহেব। ফুটফুটে ছোকরা। দ্বাররক্ষী সন্ন্যাসীকে দানাকালী বললে, ঠাকুরের নতুন ভক্ত ইংরেজ এক ছোকরা, ঠাকুরকে একবারটি দেখতে চায়, পথ ছেড়ে দাও। কী ভাবল দ্বাররক্ষী, পথ ছেড়ে দিল। দিব্যি

হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি-পরিবেশ তাকে একবাক্যে বলছিল, প্যাট্রিক, প্যাট, তোর কোনো আশা নেই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবিও গোলাম। আজন্ম শুনতে-শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপ্‌নটাইজ—সম্মোহিত করে রাখলে সে অতি নীচ, অতি অপদার্থ—তার ব্রহ্মও সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামামাত্র চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল, প্যাট, তুইও মানুষ আমরাও মানুষ, মানুষই তো সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, সাহসে বুক বাঁধ্। প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো, সঙ্গে-সঙ্গে তার ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি-পরিবেশও ধুয়ো ধরল, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

বিবেকানন্দ কি শুধুই একজন দার্শনিক, বৈদান্তিক, বা সমাজ-তান্ত্রিক? সে মানবচেতনার সর্বোচ্চ শিখর। সে ঈশ্বর-আরূঢ়, ঈশ্বরে ওতপ্রোত।

হাতরাশ রেল স্টেশনের এসিস্ট্যাণ্ট স্টেশনমাস্টার শরৎগুপ্ত যখন স্বামীজির সঙ্গে বেরিয়ে যেতে চাইল সন্ন্যাস নিয়ে, তখন স্বামীজি আপত্তি করল: 'কেন, ঈশ্বর কি তোমার গৃহে নেই? নেই কি তোমার নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে?' 'আছেন।' বললে শরৎগুপ্ত, 'ঈশ্বর সর্বভূতে এ-কে না জানে? কিন্তু যেখানে আপনি সেখানে ঈশ্বর বেশি প্রজ্বলন্ত।'

স্বামীজির ডাক সেই প্রজ্বলন্ত ব্রহ্মশ্রীতে—ব্রহ্মানুভূতিতে—যে অনুভূতিতে সে শিকাগো ধর্মমহাসভায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমার আমেরিকাবাসী ভাই-বোন বলে সম্বোধন করেছিল, আর যে ডাক শুনে সাত হাজার শ্রোতা একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল, উত্তাল হয়ে উঠল আনন্দে, চেয়ার বেঞ্চ টপকে ছুটল তার পোশাকটা স্পর্শ করতে।

রিজলি-ম্যানরে মিসেস ব্লজেটের ঘরের দেয়ালে স্বামীজির

পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি। জোসেফাইন ম্যাকলাউড জিগগেস করল, 'উনি কে?'

সত্তর বছরের গাম্ভীর্য ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সমুন্নত হয়ে মিসেস ব্লজেট বললে, 'যদি এই পৃথিবীর মাটিতে কখনো কোনো ভগবান থেকে থাকেন তবে ইনিই তিনি।'

ডেট্রয়টে একদিন বক্তৃতা শোনার পর মার্গারিট কুক অভিনন্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল স্বামীজির দিকে। স্বামীজি কিছুক্ষণ তার হাতখানি ধরে রইল। কী বলবে, কিছু বলার আছে কিনা ভেবে পেল না মার্গারিট।

কী পেলাম সেই স্পর্শে? বলছে মার্গারিট, সেই স্পর্শে বুঝলাম কাকে বলে পবিত্রতা, কাকে বলে মহত্ব। পাছে সেই স্পর্শের স্বাদ চলে যায় সেই ভয়ে তিন দিন হাত ধুইনি।

তিন দিন হাত ধোওনি?

না। যেদিন ধুলাম সেদিন আমি আবার সাধারণ মানুষ হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে যে চেতনার ঝঙ্কার চলছিল তা থেমে গেল।

সেই ঈশ্বরচেতনার ঝঙ্কারে সমস্ত জীবন আলোকিত রাখো এই তো বেদান্তের কথা। বেদান্তে বিশ্বাসই তো বীর্যলাভের উপায়। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। তরবারি আমাকে ছিন্ন করতে পারে না, আগুন দগ্ধ করতে পারে না, প্রস্তর দীর্ণ করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না। আমিই সর্বাত্মা সর্বশক্তিমান। এই অভীঃ মন্ত্র বেদান্তেরই উচ্চারণ। আর বেদান্তের প্রত্যক্ষ ফলই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য নেতিবাদ নয়, নঙর্থক নয়, বৈরাগ্য বৈরস্য নয় বৈমুখ্য নয় বৈতৃষ্ণ্য নয়—বৈরাগ্য হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি প্রবল প্রগাঢ় সক্রিয় অনুরাগ। আর তাকিয়ে দেখ চারদিকে, সমস্ত বস্তু ভয়ান্বিত—ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, বিত্তে রাজভয়, মানে দৈন্যভয়, বলে শত্রুভয়, রূপে জরাভয়, শাস্ত্রে তর্কভয়, গুণে

নিন্দাভয়, দেহে যমভয়—সমস্ত বস্তু ভয়ান্বিত, একমাত্র বৈরাগ্যই অভয়। আর বিবেকানন্দের সাম্যবাদ সেই অভয়ে।

যাকে দেখে তাকেই হাত তুলে নমস্কার করে আর বলে, নারায়ণ। ব্যক্তি-নির্বিশেষে সকলকে নারায়ণ বলে নমস্কার করো। বিবেকানন্দের সাম্যবাদ এই নমস্কারে। 'সর্বদেবোনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি।'

৪

ভারতসাধক বিবেকানন্দ

দেশ কাল নিমিত্তের জাল সরিয়ে ফেললে সবই এক, এক অখণ্ড সত্তা, আর এই অখণ্ড স্বরূপই ব্রহ্ম। স্বামীজি বলছে। নির্বিকল্পে পৌঁছে আবার সে নেমে আসছে দেশে, কালে, নিমিত্তে। এও সেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, গায়ক সা থেকে নি-তে ওঠে কিন্তু নি-তেই অবস্থান করে না, আবার সা-তে নেমে আসে। তেমনি দেশকালহীনতায় উঠে গেলেও আবার দেশে-কালেই ফিরে আসতে হয়। লোকে ছাদে ওঠে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করবার জন্যে যে যে-উপাদান দিয়ে তার ঘর মেঝে দেয়াল তৈরি, ঠিক সেই উপাদানেই ছাদ তৈরি। যা ব্রহ্ম তাই জীব। যা জগদতীত সত্তা তাই দেশ। ছাদে তো কেউ আর স্থায়ী বসবাস করে না, আবার ঘরে নেমে আসে। তেমনি জগদতীত সত্তা থেকে তোমার দেশে, ভারতবর্ষে নেমে এস।

দেশকে ভালো না বাসলে পৃথিবীকে ভালোবাসবে কী করে? 'যে ভাইকে তুমি দেখছ,' বলছে স্বামীজি, 'তাকে যদি ভালো না বাসতে পারো তবে যাকে কখনো দেখনি তাকে কী করে ভালো-বাসবে? নিজের মাকে যদি ভালো না বাসো, তার জন্যে যদি কিছু না করো তবে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীকে ভালোবাসবে কী করে, তাকে দেবে কোন উপচার?'

'গাছ বাঁচে মূলে জল দিলে।

পৃথিবীরে ভালোবাসা যায় স্বদেশেরে প্রথমে বাসিলে॥'

'আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন', বলছে স্বামীজি, 'অন্যান্য অকেজো দেবতাদের কিছু দিন ভুলে থাকলে ক্ষতি নেই। আর-আর দেবতারা ঘুমুচ্ছেন। তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। সর্বত্রই তাঁর হাত পা কান

চোখ—তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। কোন অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ছুটেছ, আর তোমার সামনে তোমার চারদিকে যে দেবতাকে দেখছ সেই বিরাটের উপাসনা কেন করছ না? কেন পারছ না করতে? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হবে তখনই আর-আর দেবতার উপাসনায় তোমার যোগ্যতা আসবে। আধ মাইল পথ হাঁটতে পারো না, হনুমানের মত সমুদ্র পার হতে চাও? সকলেরই যোগী হবার সাধ, সকলেই ধ্যান করতে, ধ্যানে বসতে উন্মুখ, যেন সন্ধেবেলায় খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বার তিনেক নাক টিপলেই হয়ে যাবে! এ কি তামাসা? আসল দরকার—চিত্তশুদ্ধি। কিসে এই চিত্তশুদ্ধি হবে? চিত্তশুদ্ধি হবে পূজায়—বিরাটের পূজায়। তোমার সামনে তোমার চারদিকে যাঁরা রয়েছেন—তোমার স্বদেশবাসিগণ—তাঁদের পূজা। এঁদের পূজা করতে হবে—সেবা নয়, সেবা বললে আমার অভিপ্রেত ভাব ঠিক বোঝা যাবে না—পূজা-শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ পাবে। এই সব মানুষ ও পশু—এরাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রধান উপাস্য।'

দেখছ কী উন্নত-উজ্জ্বল পুরুষ! আমেরিকা বিস্ময়মুগ্ধ চোখে দেখছে স্বামীজিকে। যখন ঈশ্বরের কথা বলছে তখন যেন ঊর্ধ্বশিখ আগুনের মত জ্বলছে, আর লক্ষ্য করেছ যখনই দেশের কথা বলছে, তখনই কণ্ঠস্বর কেমন মেদুরার্দ্র হয়ে আসছে, সে যেন আর বীর্যবান সন্ন্যাসীর সুর নয়, এক মাতৃগতপ্রাণ মাতৃময়জীবিত সন্তানের সুর। হাঁ, আমার দেশই আমার মা।

দেশমাতাই জগন্মাতা।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশ—ভারতবর্ষে জনকের ধারণা থেকে জননীর ধারণা উচ্চতর। ভারতে মা-ই নারীচরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। মা নাম করলেই সর্বশক্তিমত্তার ভাব এসে থাকে, শিশু যেমন নিজের মাকে সর্বশক্তিমতী বলে ভাবে—মা সব করতে পারে। সেই

জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাঁকে পূজা না করে আমরা নিজেদের কখনো জানতে পারি না, জাগাতে পারি না।

ভারতে প্রথমে গৃহমাতা, ক্রমে দেশমাতা এবং শেষে জগন্মাতা।

সমস্ত ভারতবর্ষ খালি পায়ে হেঁটেছে, দেশের মাটিকে দেশের ধূলিকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করেছে, গায়ে মেখেছে, আস্বাদ করেছে মাটির সঙ্গে মানুষের মমতাময় আত্মীয়তা। গেরুয়া পরেছে ঠিকই, গেরুয়া রঙের নয়নসুখ পরেনি। লিখছে অখণ্ডানন্দকে : বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর হে প্রভু, রামকৃষ্ণ বলায় কোনো ফল নেই, যদি স্বদেশবাসী গরিবদের কিছু উপকার করতে না পারো। মধ্যে মধ্যে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে চলে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যাশিক্ষা দাও। কর্ম উপাসনা জ্ঞান—এই তিন কর্ম করো তবেই চিত্তশুদ্ধি হবে নতুবা সব ভস্মে ঘৃতার্পণ। অচ্যুতানন্দ এলে দুজনে মিলে রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরিবদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খেলে লোকে বিরক্ত হয় তদ্দণ্ডেই তা ত্যাগ করবে। পরোপকারার্থে ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করা ভালো। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্যে নয়, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে জগদ্ধিতায় দিতে হবে। দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী কাতর—এরাই তোমার দেবতা হোক—এদের সেবাই পরমধর্ম।

স প্রত্যক্ষ একঃ সর্বেষাং প্রেমরূপঃ—তিনিই প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কী কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো হে বাপু! বেদ, কোরান, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তিলাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান, দয়া-প্রেমের পুজো হোক দেশে। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি। সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। লোক না পোক! অভীঃ, অভীঃ। বেদান্তবীর্যে প্রতিষ্ঠিত হও।'

এই বীর্যবত্তা সর্বৈক-ঈশ্বরসত্তার সাধনাই ভারতের সাধনা।

হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত হেঁটেছে। কাশী, অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হাতরাস—হিমালয়। আবার রাজপুতানা, আলোয়ার, জয়পুর, আজমির, খেতড়ি, আহমেদাবাদ, কাঠিয়াওয়াড়, জুনাগড়, পোরবন্দর, দ্বারকা। তারপরে বরোদা, খাণ্ডোয়া, বোম্বাই, পুনা, বেলগাঁও। দক্ষিণে বাঙ্গালোর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, মাতুরা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী। যত মানুষের যত সমাজ আছে, অভিজাত থেকে অপজাত, যত ঘর আছে, অট্টালিকা থেকে কুটির, রাজপ্রাসাদ থেকে কুলিধাওড়া, সর্বত্র অতিথি হয়েছে। প্রত্যক্ষ করেছে দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য আর দারিদ্র্য, প্রাচুর্য্য আর রিক্ততা—প্রত্যেক ধূলিকণাকে স্বীকার করেছে তীর্থ বলে। বাস্তবের কাঠিন্য ও রুক্ষতার মধ্যে আবিষ্কার করেছে দৈবী সত্তার মহিমা।

প্রত্যক্ষ করল শাশ্বত ভারতের শিবমূর্তি। নিরন্ন দরিদ্র আর প্রাচুর্যফেনিল মহারাজ, অসুস্থ ভিক্ষুক আর বলগর্বিত মোগল—সবাই সেই একজন। বিচিত্র দেশে একের আনাগোনা—রঙ্গমঞ্চে একেরই প্রবেশ-প্রস্থান। যখন সেই একজনকে ভালোবাসি, তখন সকলকেই ভালোবাসি। তাই বিবেকানন্দ আস্তাবলে সহিসদের সঙ্গে শুয়েছে, শুয়েছে গাছতলায় ভিক্ষুকদের সঙ্গে, আবার কখনো রাজপ্রাসাদে, সুখশয়নে। একবার তো মধ্যভারতে মেথরদের বস্তিতে কদ্দিন কাটিয়ে এল। দেখল কোথাও ভেদ নেই, ব্যবধান নেই—ভস্মস্তূপের নিচে একই আত্মার হীরকখণ্ড। সর্বত্র এক, সমস্ত এক—এক ছাড়া দুই নেই কোনোখানে।

এই বেদান্তদৃষ্টি এই সমত্ববুদ্ধি ভারতবর্ষ ছাড়া আর কার?

মেরী হেলকে লিখছে, 'প্রিয় মেরি, শত শত রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে পুজো করেছে, আর সমস্ত দেশের ভেতর যেরূপ আদর-অভ্যর্থনার ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে এমনটি আর কারু হয়নি। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হত যে শান্তিরক্ষার জন্যে পুলিশের

দরকার হত। তবু তোমাকে বলি, নামযশ প্রতিষ্ঠায় আমার রুচি নেই, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার তা আমার প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি হয়ে গেছে। আমার শুধু এই প্রার্থনা, নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন আর যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী সেই ভগবানের পূজার জন্যে আমি যেন বার-বার জন্মগ্রহণ করি আর সহস্র-সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি। আর আমার সর্বাধিক উপাস্য দেবতা হোন আমার পাপী নারায়ণ, আমার তাপী নারায়ণ, আমার সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্র নারায়ণ।

হে মূর্খ, যে সকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত তাকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ! তাঁর—সেই প্রত্যক্ষ দেবতারই উপাসনা করো, আর-আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।'

বলো সোঽহং, শিবোঽহং। মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরে দুস্তরে, অরণ্যে রণে দারুণে, পর্বতে সমুদ্রে—যেখানেই পড়ো না কেন, সর্বদা বলতে থাকো, আমিই সেই আমিই সেই। কোথায় আমার ভয়, কোথায় আমার পাপ, কোথায় আমার দৌর্বল্য। আমিই নিত্যমুক্ত নিত্য-পরিপূর্ণ, আমিই সেই স্বপ্রকাশ পুরুষ। আমি দেহ নই, জড় নই, আমি আত্মা, আমি ব্রহ্ম—এই আমার ধর্ম, হিন্দুধর্ম।

বলো, হিন্দুধর্মের মত আর কোন ধর্ম এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা কীর্তন করেছে? হ্যাঁ, আছে অনেক স্বার্থান্ধ ভেদবুদ্ধি, অনেক আসুরিক অত্যাচার কিন্তু তার জন্যে দায়ী ধর্ম নয়, দায়ী সমাজ, সমাজ-ব্যবস্থা।

কন্যাকুমারিকায় যখন এসে পৌঁছল, স্বামীজির ইচ্ছে হল সমুদ্রের মধ্যে অনতিদূরে যে শিলাখণ্ডটা আছে সেখানে যাবে। কিন্তু কী করে যাবে?

'একটা নৌকো করুন।' পারের লোক কে বললে।

'নৌকো?'

'কেন, পয়সা নেই ?'

স্বামীজি হাসল, বললে, 'গ্রন্থিও নেই।'

'তবে যাবেন কী করে ?'

'কেন, সাঁতরে।'

'হাঙর-কুমির আছে যে—'

'কী করবে হাঙর-কুমির ? মেরে ফেলবে ? তার বেশি কিছু নয় তো ?' বলে স্বামীজি সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। উত্তাল সমুদ্রকে সবল বাহুতে পরাভূত করে উঠল এসে শিলাখণ্ডে। সবাই জানে সেই শিলাখণ্ডে বসে স্বামীজি ধ্যান করেছিল। কিন্তু ধ্যানে বসবার আগে সে ঊর্ধ্ব-উচ্ছ্রিত স্তবের মত দাঁড়াল শিলাখণ্ডে। দাঁড়াল ভারতবর্ষের দিকে মুখ করে। তুই বাহু বাড়িয়ে দিল। এক বাহুতে পৌরুষ আরেক বাহুতে প্রেম। যেন গোটা দেশটাকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরল। জ্ঞান আর প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে কে আর এমন একাত্ম করে দেখেছে দেশকে !

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সূর্য-চন্দ্র একসঙ্গে। সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য, সর্বপ্রেমমোহনাত্মা সুধাংশু।

শিকাগোর ধর্মমহাসভায় প্রথম দিনের বক্তৃতায় বিবেকানন্দ কী বিশাল উত্তাল অভিনন্দন পেয়েছিল তা ইতিহাস হয়ে আছে। বক্তৃতান্তে হোটেলে ফিরে এসে স্বামীজি কাঁদতে বসল। ঈশ্বরের কৃপার কথা ভেবে নয়, অসাধ্যসাধন হল বলে নয়, মূককে বাচাল করলেন বা পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করালেন—তার জন্যেও নয়। কাঁদতে বসল ভারতবর্ষের কথা ভেবে। আর দেশ তো মাটি কিংবা জল বা পাথর নয়, দেশ হচ্ছে মানুষ। কাঁদতে বসল বঞ্চিত অধঃপতিত হৃতসর্বস্ব স্বদেশবাসীদের তুঃখের কথা ভেবে। আমার দেশের লোকের যখন এত তুঃখ এত দৈন্য তখন এই যশ ও সমাদর দিয়ে আমার কী হবে ? যদি দেশকে দেশবাসীকে টেনে তুলতে পারি তার অভাবের পঙ্ককুণ্ড থেকে তবেই আমার সমাদর।

তোমার দেশ কী দিয়েছে ? কী শিখিয়েছে ?

শিখিয়েছে পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। ভারতবর্ষ কাউকে কোনোদিন পীড়ন করেনি, বরং পরকে আশ্রয় দিয়েছে, আবাস দিয়েছে, আরাম দিয়েছে। পরের জন্যে নিজের মুক্তি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। পরহিতে স্বার্থত্যাগ সর্বস্বত্যাগকেই বড় বলে মেনেছে।

সেবার কী হল ?

ডক্টর রাইট বস্টনে, স্টেশনে এসে স্বামীজিকে শিকাগোর ট্রেনে তুলে দিলেন। দেখলেন কামরায় তাঁর এক পরিচিত ধনকুবেরও চলেছে শিকাগোতে। স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, এ এক হিন্দু সাধু নতুন আমেরিকায় এসেছে। চলেছে ধর্মসভায় যোগ দিতে। শিকাগোতে কাউকে চেনেনা-জানেনা, তুমি দয়া করে ওকে যথাস্থানে পেঁাছে দিও।

তা নিশ্চয়ই দেব। ধনকুবের প্রতিশ্রুতি দিল।

সন্ধ্যার কাছাকাছি শিকাগোতে ট্রেন এসে দাঁড়াল। স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়। স্বামীজি নামল। কিন্তু কোথায় সেই ধনকুবের। সে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। তার বয়ে গিয়েছে সাহায্য করতে। কে কোথাকার এক মাথায় বস্তাবাঁধা অদ্ভুত সন্ন্যাসী, একটা পরাধীন দেশের লোক, তার জন্যে মাথাব্যথা—সময়ের অপচয়।

স্বামীজি বললে, এইখানে—এইখানে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের তফাৎ। ভারতবর্ষ হলে কখনোই আতিথেয়তায় এমন দীন হত না, সাহায্য করতে না পারলেও সৌজন্য দেখাত, অন্তত একটু প্রিয় না হোক নম্র সম্ভাষণ করে যেত—এমনি করে একটা সর্বস্বান্ত হৃদয় দেখিয়ে পালাত না। বললে, ভারতবর্ষ চিরকাল পরের জন্যে করেছে পরের জন্যে লড়েছে—আর পশ্চিম ? চাচা আপন বাঁচা।

কী শিখিয়েছে ? শিখিয়েছে ঈশ্বরে আর আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম,

সন্দেহই পাপ। অভেদবুদ্ধি, অভেদদর্শনই সত্য আর ভেদবুদ্ধি, ভেদদর্শনই মিথ্যে।

যীশুখৃস্টের দিকে তাকাও, তাকাও বুদ্ধের দিকে।

যীশু ইহুদি ছিলেন আর বুদ্ধ ছিলেন হিন্দু। ইহুদিরা যীশুকে শুধু পরিত্যাগ করেছিল তাই নয়, ক্রুশবিদ্ধও করেছিল। আর হিন্দুরা? তারা বুদ্ধকে শুধু গ্রহণই করেনি, অবতাররূপে পূজা করেছে।

কিন্তু তোমরা দরিদ্র কেন?

তাই বলে আমাদের ধর্ম দরিদ্র নয়। আমরা নিজেরা অধঃপতিত বলে আমাদের ধর্ম অধঃপতিত নয়। আমাদের দারিদ্র্যের জন্যে মূলে আমরাই দায়ী—মেনে নিচ্ছি, কিন্তু ইংরেজকে তুমি কী বলবে? যে নিজের ফুর্তির জন্যে আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত শুষে নিয়েছে। সহস্র হাতে আমাদের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছে যাতে আমরা নিরন্নের দল পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। তাদের পশুশক্তির নির্লজ্জ প্রতীক হচ্ছে বুট আর বুলেট। একটা গোটা দেশের মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়েছে, দেহ থেকে খসিয়ে নিয়েছে মেরুদণ্ড।

'ভারতবর্ষে কী রেখে যাবে ইংরেজ?' বলছে বিবেকানন্দ: 'হিন্দু রাজারা রেখে গিয়েছে মন্দিরের পর মন্দির, মুসলমান রাজারা রেখে গিয়েছে সৌধের পর সৌধ আর ইংরেজ? ইংরেজ কী রেখে যাবে? রেখে যাবে ভাঙা ব্র্যাণ্ডি-বোতলের স্তূপ।'

স্বামীজি কি জানে না তার দেশের কী দুর্দশা, কী দুর্গতির মধ্যে সে নিমজ্জিত! তাই নিবেদিতাকে লিখছে:

'তোমাকে খোলাখুলি বলছি, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—সৎকাজে অনেক বিঘ্ন। ওদেশে এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার ও দাসত্ব যে কী রকম তা তুমি ধারণাও করতে পারো না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে।

তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা। ভয়েই হোক বা ঘৃণায়ই হোক তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে আর শ্বেতাঙ্গরাও এদের প্রাণপণ ঘৃণা করে। উলটে, শ্বেতাঙ্গরা তোমাকেই পাগল মনে করবে আর তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে।

তা ছাড়া জলবায়ুও অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশের প্রায় সব জায়গার শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মত। আর দক্ষিণাঞ্চলে তো সর্বদা আগুনের হলকা চলছে। শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার উপায় নেই। যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস করো, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাব।

কাজে ঝাঁপ দেবার আগে বিশেষভাবে চিন্তা কোরো আর কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কোনো কাজে যদি বিরক্তি আসে তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্যেই কাজ করো আর নাই করো, বেদান্তধর্ম ধরেই থাকো আর ছেড়েই দাও। 'মরদকী বাত হাতীকী দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভেতরে যায় না। খাঁটি লোকের কথারও তেমনি নড়চড় নেই—এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

কিন্তু তাই বলে নিছক নিন্দা করে লাভ কী?

আবার লিখছে: 'যে ব্যক্তি সত্যসত্যই জগতের দায় নেয় সে জগৎকে আশীর্বাদ করতে-করতে আপন পথে এগিয়ে চলে। তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও সমালোচনার কথা থাকে না—তার কারণ এ নয় যে জগতে পাপ নেই, আসলে তার কারণ এই যে সে নিজে তা কাঁধে তুলে নিয়েছে—স্বেচ্ছায়, নিজের গরজে। যে উদ্ধার করবে তাকে সানন্দেই পথ চলতে হবে, যারা উদ্ধার হতে আসবে তারা তোমার পথে আসুক আর নাই আসুক।'

তবু সমস্ত দোষ সমস্ত কলুষ সমস্ত মালিন্য সত্ত্বেও আমার জন্মভূমি গুণগরিষ্ঠা।

শিকাগোর ধর্মমহাসভায় যোগ দেবার আগে কিছুকাল স্বামীজিকে থাকতে হয়েছিল বস্টনে, শস্তার জায়গায়। সে শহরে এখানে-সেখানে আড্ডায়-আখড়ায় খুচরো-খাচরা বক্তৃতা দিতে হয়েছে স্বামীজিকে, স্থানীয়দের ফরমাস মত। পিছিয়ে যায়নি স্বামীজি। যত সব গোলমেলে বিষয়—তা হোক, ঠাকুরের কথায়, গোলমালের মধ্যে গোলও আছে মালও আছে—গোল ছেড়ে দিয়ে মালটুকু নাও। অসারের থেকেই সারোদ্ধার করে বিতরণ করব তোমাদের।

প্রথম বিষয় ছিল, হিন্দুদের জাতিভেদ।

জাতিভেদ, ভুল কোরো না, এসেছে সামাজিক প্রথা থেকে, কর্ম-বিভাগ থেকে, ধর্ম থেকে নয়। কালের নিয়মে সমাজের বিবর্তন হবে, উঠে যাবে জাতিভেদ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাবে, কিংবা তারও আগে থেকেই প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের ফলেই উঠতে থাকবে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম, যে ধর্ম বেদান্তের স্রষ্টা, তাকে কেউ নড়াতে পারবে না টলাতে পারবে না কোনোদিন। সে ধর্ম তো কোনো ব্যক্তিকে প্রচার করে না, আদর্শকে প্রচার করে। সেই আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। ঈশ্বরত্ব।

আর তোমাদের জাতিভেদ সম্পর্কে কী বলবে ? কর্মের ভেদ নয় চর্মের ভেদ। যেহেতু গায়ের রঙ কালো সেইহেতু তার গায়ের চামড়া ছুলে নাও, তাকে জ্যান্ত পোড়াও। তোমরা কী নিদারুণ সভ্য, তোমাদের হাতে মানব অধিকারবাদের কী অনবদ্য রূপায়ণ !

কিন্তু তোমাদের সতীদাহ ? আরেক সভায় ধরল স্বামীজিকে।

সে-প্রথা তো উঠে গেছে। যা এখন আর চালু নয় তাকে টানো কেন ? কিন্তু তবু বলি, এ প্রথার জন্ম হয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অচ্ছেদ্য অনুরক্তি থেকে। যেমন রাজপুতরমণীদের জহর ব্রত এসেছে সতীত্বের প্রতি গভীর মর্যাদাবোধ থেকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক বিধবাকে জোর করে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ

করা হয়েছে—সে বর্বরতা অমার্জনীয়, কিন্তু যে প্রেমের থেকে, মৃত্যুতেও স্বামী-স্ত্রী অভেদ এই সুদৃঢ় বিশ্বাস থেকে আত্মাহুতি দিল তাকে তুমি মূল্য দেবে না, তার আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে দেখবে না প্রশংসার চোখে ?

কিন্তু, যাই বলো, তোমাদের নারীদের সামাজিক দুর্গতি ভয়াবহ। সেই সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করো।

আরেক সভায় দাঁড়াল স্বামীজি। এই বিষয় নিয়ে আরো অনেক সভায়।

অস্বীকার করব না যে দুর্গতি বর্তমান। কিন্তু তার কারণ পর্দা ও অশিক্ষা। পর্দার কারণ ঐতিহাসিক, অশিক্ষার কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক। এ-সব তো সাময়িক সমস্যা, কালধর্মে দেখতে-দেখতে অদৃশ্য হবে। কিন্তু ভারতীয় নারীর যে মহিমা তা চির-অম্লান থাকবে। বলছে স্বামীজি, 'পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন দেখলাম না।'

ভারতে যখন আমরা আদর্শ রমণীর কথা ভাবি তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে—মাতৃত্বেই তার আরম্ভ মাতৃত্বেই তার শেষ। মাতৃত্বেই তার পরাকাষ্ঠা। আর পাশ্চাত্যে নারী—স্ত্রীশক্তি। ভারতবর্ষ এই 'মা' দিয়েছে, ঈশ্বরকে আমরা মা বলে ডাকি। এর চেয়ে পবিত্র এর চেয়ে মধুর এর চেয়ে আন্তরিক আর কোনো ডাক নেই। মা-ই করুণা ও ভালোবাসার আদর্শ-স্বরূপা। স্বার্থলেশহীনা সর্বংসহা ক্ষমাময়ী মা—স্ত্রী তাঁর পশ্চাদনু-সারিণী ছায়া। তোমাদের পরিবারে স্ত্রীই সর্বেসর্বা, মা যদি সেখানে থাকেন তিনি স্ত্রীর দাসী হয়ে থাকবেন। ভারতের পরিবার মা'র কর্তৃত্বাধীন। মা'র আগে যদি আমরা মরি—সেই মৃত্যুসময়েও স্ত্রী-পুত্রকে আমরা মায়ের স্থান অধিকার করতে দিই না—আমরা মায়ের কোলেই মাথা রেখে মরতে চাই। তোমাদের দেশে এমন ছেলে

দেখলাম না যে মাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। কোন এক ছেলে টাকা রোজগার করে এনে কিছু অংশ তার মাকে দিয়েছে, সে কী হৈ-চৈ। আমাদের দেশে এ নিত্যকার ঘটনা। রোজগারের সমস্ত টাকাই সে মায়ের হাতে তুলে দেয়।

আমরা হিন্দুরা ঈশ্বরকে দেনেওয়ালা রাজা বলে মানি না, ঈশ্বরকে পিতা বলতেও আমরা ভয় পাই, দূর দূর মনে হয়, কেননা হিন্দু পিতারা ছেলেদের শাস্তি দেয় প্রহার করে। ঈশ্বর আমাদের মা, তোমাদের যীশুর যেমন ম্যাডোনা। আমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাকি, মায়ের মত ভালোবাসি। সে আমাদের অহেতুক ভালোবাসা। যে মা গরিব, কিছু দেবার-থোবার যার সাধ্য নেই, সঙ্গতি নেই, তাকেও তার ছেলে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসে। কিছু চায় না কিছু পায় না তবুও ভালোবাসে। এ রকম ভালবাসা বাসতে পারো ? ভাবতে পারো ? ভালোবাসায় যদি মতলোব থাকে, বলো তা হলে কি তাতে সুখ আছে ?

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল স্বামীজি। শিষ্যকে বললে, 'দেখছিস অন্ধকারের কী এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা!' স্থির তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরে গান ধরল :

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥'

গান সাঙ্গ করে বসল আর মা-কালী মা-কালী বলতে লাগল।

'আপনি যেন কী রকম হয়ে গেলেন অন্ধকার দেখে!' শিষ্য বললে।

স্বামীজি মৃদু হাসল। আবার গান ধরল : 'কখন কী রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।—কালী সুধা-তরঙ্গিণী।' গান থামিয়ে বললে, 'এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, সাপের চলা আর সাপের স্থির হয়ে থাকা—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এবার ভালো হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পুজো করব।' বলে উঠল স্বামীজি, 'রঘুনন্দন বলেছেন, নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্—এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন, মা'র ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।'

হিমালয়ে আছে স্বামীজি, অরুণোদয়ে দেখছে গিরিরাজকে। তুষারশীর্ষে প্রভাতের আলো পড়েছে।

নিবেদিতাকে বললে, 'ঐ দেখ। ঐ যে তুষারমণ্ডিত সুশুভ্র শৃঙ্গ—ও হচ্ছে শিব আর ওর উপরে যে রক্তিম আলোকচ্ছটা—ঐ হচ্ছে উমা। জগজ্জননী।'

অম্ভোরুহশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

'কিন্তু তোমাদের পৌত্তলিকতা?' আমেরিকা আবার প্রশ্ন করল।

অত বড় একটা প্রতীক, হিমালয়, চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা করি কী। কিন্তু বলিহারি তোমার বুদ্ধি, আমরা বুঝি পুতুল পুজো করি? আমাদের প্রতিমা পুতুল নয়, সেই প্রতিমা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। যে ঈশ্বর অনন্ত তাকে তুমি কী করে কল্পনায় আনবে? একটা কিছু স্মারকচিহ্ন পেলে সুবিধে হয় নাকি? তাই সীমাবদ্ধ ঘটের শূন্যতাই মহাকাশের প্রতীকের কাজ করে। কিন্তু জিগগেস করি পৌত্তলিক কে নয়? আমি অনেক ভক্ত খৃস্টানকে জিগগেস করেছি, বুকে হাত দিয়ে বলো তো, উপাসনার সময় কী ভাবো? শূন্য? শূন্য কখনো ভাবা যায়? আমাকে কেউ বলেছে চার্চ ভাবি, কেউ বলেছে ক্রুশ, কেউ স্বয়ং যীশু। সাধারণ মানুষ মূর্তি ছাড়া ধরবে কাকে? অক্ষর ছাড়া কী করে বাক্যকে ধরবে? বাক্য ছাড়া কী করে ধরবে ভাবকে?

সকলেরই জন্মগত পৌত্তলিকতা, আর সেটা যখন মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার তখন সেটাকে খারাপ বলো কী করে? তোমরা কি এই জগৎরূপ প্রকাণ্ড পুতুলটার পুজো করছ না? তোমরা তো জড়বস্তু নও, তোমরা তো চৈতন্যময়, অথচ নিজেদের কেবল শরীর বলে ভাবো, সেই শরীরের কেবল ভোগ চড়াও—এ কি পৌত্তলিকতা নয়? যখন বলো, 'আমি', তখন তোমার চিন্তায় শরীর আসে কি আসে না—সত্যি করে বলো। যদি শরীর-চিন্তা আসে তা হলে নিশ্চয় তুমি পুতুলপূজক।

ধর্ম, বলছে বিবেকানন্দ, বুদ্ধির কচকচি নয়, ধর্ম প্রত্যক্ষানুভূতি। সে অনুভূতির জন্যে চিন্তা বা দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রার্থনা ও ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরকে জানা যায়—তার সামনে মূর্তি না শূন্য, কিছু এসে যায় না। শুধু আসক্তি ও কামনাকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আন্তরিক হয়েই পাওয়া যায় ঈশ্বরকে।

শ্রেষ্ঠ মূর্তিপূজককে দেখ, তার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি মূর্তিপূজার ফলে ঐ রকম অমৃতময় পুরুষ পাওয়া যায় তা হলে মূর্তিপূজাকে কেন নিন্দে করবে?

আসলে হিন্দু ভাবতে চেষ্টা করে যে সে সোঽহং, সে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। ভাবতে চেষ্টা করে সে দেশেকালে সীমাবদ্ধ নয়, সে জন্মহীন, মৃত্যুহীন, তার পিতা নেই, মাতা নেই, জাতি নেই, সংসারে কোনো আত্মীয়বন্ধু নেই, সেই নির্বিকল্প নিরাকার।

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে মাতা নৈব মে জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

এই আত্মস্বরূপে চিন্তা করতে সাধারণ মানুষ সক্ষম হয় না, তখন সে চোখ খোলে, বলে, প্রভু, আমার অসামর্থ্যকে ক্ষমা করো, তোমাকে আত্মস্বরূপে ধ্যান করতে পারলাম না, তাই সাকার মূর্তিতেই তোমাকে চিন্তা করি, প্রণাম করি, প্রার্থনা জানাই, আর আমার এই অসম্পূর্ণ পূজার জন্যে আমাকে অপরাধী করো না।

ব্যাসদেবের তো সেই প্রার্থনা, আমাকে ক্ষমা করো। হে জগদীশ্বর, তুমি রূপবর্জিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করেছি। তুমি বাক্যের অতীত অথচ আমি স্তবস্তুতি করে তোমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করেছি। তুমি সর্বব্যাপী অথচ আমি তীর্থ ভ্রমণ করে তোমার সেই সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। আমি ঘোরতর অপরাধী। আমার এই বিকল্পতাদোষত্রয় মার্জনা করো।

কিন্তু ম্যাক্সমুলারের ভারতবর্ষের প্রতি কী অনুরাগ! ভারতবর্ষই আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি। পঞ্চাশ বছরেরও উপর ভারতীয় চিন্তা-রাজ্যে বাস ও বিচরণ করছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল অরণ্যে ঘুরে ঘুরে আলোছায়ার খেলা দেখেছেন, ফল-ফুল কুড়িয়েছেন, আঘ্রাণে-আস্বাদে মাতোয়ারা হয়েছেন। এ কেমন করে হয়? শুধু তাই নয়, সুদূর বাঙলার কোন এক অকিঞ্চিৎ গ্রামের এক দরিদ্র অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের জীবন ও উপদেশ জেনে নিয়েছেন আদ্যোপান্ত। 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক শ্রদ্ধাপ্রেমদীপ্ত প্রবন্ধ লিখেছেন। এ কী করে সম্ভব হল? তিনি কী করে টের পেলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রাচীন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও ভবিষ্যৎ ভারতের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস। শ্রীরামকৃষ্ণই সমগ্র ভারতবর্ষ—অতীত ও বর্তমান।

অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে স্বামীজি।

কে কাকে দেখে? যেন বশিষ্ঠের আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন।

ধর্মের উদ্দেশ্য কী। ধর্মের উদ্দেশ্য ধর্ম। কৃষ্ণদর্শনের ফল কী? কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন।

'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।' গীতায় ভগবান বলছেন, আমার ভক্তের যারা ভক্ত তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাই আপনাকে আমার দেখতে আসা। আপনার কাছে আমার আসা তীর্থযাত্রার সমান।

স্বামীজিকে পেয়ে ম্যাক্সমুলারের সে কী আনন্দ! কত যত্ন

কত সেবা কত সহৃদয়তা! তাঁর সহধর্মিণীও সেই এক ব্রতে সমাসীন।

স্বামীজি বললে, 'আজকাল হাজার হাজার লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করছে।'

রজতশুভ্র কেশ, ললাটে শৈশবের সারল্য, প্রসন্ন মুখে ম্যাক্সমুলার বললেন, 'এমন লোককে পুজো করবে না তো কাকে করবে?'

অনেক কথার পর স্বামীজি জিগগেস করলে, 'আপনি ভারতবর্ষে কবে যাচ্ছেন?'

আশ্চর্য, ম্যাক্সমুলারের চোখে একবিন্দু অশ্রু এল, কিন্তু মুখে হাসি—মৃদুভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'তা হলে আমি আর ফিরব না। আমার মৃতদেহকে তা হলে সেখানেই দাহ করতে হবে।'

রেল-স্টেশনে স্বামীজিকে তুলে দিতে এলেন মুলার।

'ও কী, আপনি এই বৃদ্ধবয়সে কেন এত কষ্ট করলেন?' স্বামীজি ব্যাকুল হয়ে উঠল।

মুলার স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তের সঙ্গে তো প্রত্যহ দেখা হয় না। যতক্ষণ সঙ্গ পাওয়া যায় ততক্ষণই আনন্দ।'

তোমাদের মত আমরা পরধর্মনিন্দুক নই। তাকিয়ে দেখ মিশনারিদের দিকে। বলছে বিবেকানন্দ, কী পরিমাণ বিষ ঢালছে হিন্দু দেবদেবীর উপর! আমারই দেশে এসে আমারই পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত দিচ্ছে, আমার ধর্মকে গালাগাল করছে, আমার দেশের সবকিছুকে গর্হিত বলছে। মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে-যেতে বলছে, 'এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি।' হিন্দু নিরীহ, অহিংস, সে একটু হাসে, চলে যাবার সময় বলে যায়, মূর্খেরা যা বলবার বলুক। এই হল তাদের ভঙ্গি। তোমরা, যারা অন্যকে গালাগাল দেবার জন্যে কতগুলি মানুষকে শিক্ষিত করছ, তারা আমার সামান্য সমালোচনায় আঁতকে উঠে চিৎকার

করছ, 'আমাদের ছুঁয়ো না, আমরা আমেরিকান, আমরা ধনিশ্রেষ্ঠ, বিলাসিশ্রেষ্ঠ, আমরা কুলীনতম। আমরা তুনিয়াশুদ্ধু লোককে গাল দেব, শাপ দেব, যা কিছু বলব, কিন্তু আমাদের কাছে কেউ ঘেঁষো না, আমরা স্পর্শকাতর—যেন লজ্জাবতী লতা।'

শুনতে হয়তো ভালো লাগবে না, কিন্তু জেনে রেখো, তোমাদের ক্যাথলিক চার্চ, তোমাদের খৃস্টনীতি সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। বৌদ্ধধর্মের বিস্তার হয়েছিল কী করে? এক ফোঁটা রক্তপাত না করে। এত ডম্ফাই তোমাদের, কিন্তু বলো তো—তলোয়ার ছাড়া খৃস্টধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা দেখাও—আমি তুটি চাই না। 'আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ।' কেন? 'কারণ আমরা অন্যকে হত্যা করতে পারি।' আরবরা তাই বলেছিল, তারাও ঐ বড়াই করেছিল, কোথায় তারা আজ? আজও তারা বেতুইন। রোমানরাও ঐ কথা বলত। কোথায় তারা?

'শান্তিস্থাপনকারীরাই ধন্য, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে।' আর ঐ সব অহঙ্কারের নীতি পড়বে হুমড়ি খেয়ে। স্বার্থপরতার ভিত্তির উপর যা রচিত, প্রতিযোগিতা যার প্রধান সহায়, ভোগ যার একমাত্র লক্ষ্য, আজ নয় কাল তার ধ্বংস হবেই। যদি বাঁচতে চাও, খৃস্টের কাছে ফিরে যাও। ফিরে চলো তাঁর কাছে যাঁর মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও ছিল না। পাখিদের বাসা আছে, পশুদেরও গুহা আছে কিন্তু মানব-পুত্র যীশুর এমন একটি জায়গা ছিল না যেখানে তিনি মাথা রেখে বিশ্রাম করেন। তোমাদের ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে, বিলাসের লোভ দেখিয়ে। ঈশ্বর আর ধনদেবতা ম্যামনকে একই সঙ্গে সেবা করতে পারবে না। যদি পারো—সম্পদের সঙ্গে খৃস্টের আদর্শকে মেলাও। যদি পারো মেলাতে, বেঁচে যাবে। নইলে, যদি না পারো, বরং সম্পদ ছেড়ে দাও, ফিরে চলো খৃস্টের কাছে। খৃস্টশূন্য প্রাসাদে বাস করার চেয়ে ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে খৃস্টের সঙ্গে বাস করার জন্যে প্রস্তুত হও।

আমরা তো তোমার যীশুখৃস্টকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি, টেনে নিতে পারি কী, টেনে নিয়েছি, কিন্তু তুমি আমার কৃষ্ণকে টেনে নিতে পারো ? পারো না। বুদ্ধকে টেনে নিতে পারো ? না, তাও পারো না। আমি একসঙ্গে যীশু, কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে প্রণাম করি।

তোমরা বলো আদিম পাপ, আমরা বলি আদিম পবিত্রতা। আমাদের প্রকৃত সত্তাই ঈশ্বরত্ব। আর আমাদের ধর্ম হচ্ছে সেই ঈশ্বরত্বের উদ্বোধন।

তোমাদের মিশনারিরা কী বলতে চাইছে ? আগে ঈশ্বর এক-দেহে অপবিত্র ছিলেন, খৃস্টান হবার পর সেই ঈশ্বর সেই দেহেই পবিত্র হয়ে উঠলেন ! এ পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা শুধু সহনশীল নই, আমরা বহনশীলও। আমরা শুধু মেনে নিই না, টেনেও নিই। তোমরা বড় জোর এটুকু বলতে পারো, পথ দিয়ে তুমিও চলো আমিও চলি। আমরা এর চেয়ে ঢের বেশি বলি। বলি, ভাই, কাছে এস, হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, হাত ধরাধরি করে চলি।

তোমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বার্থকেন্দ্রিক। তোমাদের ভাষায়, ব্যাকরণে, প্রথম পুরুষ, ফার্স্ট পার্সন, আমি, *I*, অহং। ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার। আমাদের ভাষায়, আমাদের ব্যাকরণে প্রথম পুরুষ, সে, তিনি—আমি নই। আমাদের সৌজন্য, সৌশীল্য, বিনয়।

'আর আমাদের হিন্দুধর্ম এ শেখায়,' বলছে বিবেকানন্দ, 'সব ধর্মই সত্য, সব ধর্মই সমান মহান। সব ধর্মই পৌঁচেছে ঈশ্বরে, সব রাস্তাই রোমে। সব নদীই সমুদ্রে। পাত্র বিচিত্র জল এক। মত বিচিত্র মানুষ এক। মানুষের ঈশ্বর এক।'

এই তত্ত্বই আমার গুরু আমার দক্ষিণেশ্বর নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তোমাদের মত, অন্ধের মত, হাতি দেখেননি

—একেক অংশে হাত দিয়ে হাতি মুলোর মত কুলোর মত দড়ির মত থামের মত বলেননি। চোখ খুলে সমস্ত হাতিটাকে দেখেছেন। সমগ্র মানুষটাকে দেখেছেন। আর এই সমগ্র মানুষটাই ঈশ্বর।

'আমি যে হিন্দু এতে আমি সুখী।' ডেট্রয়টে বলছে স্বামীজি, 'রোমানরা যখন জেরুজালেম ধ্বংস করে তখন বহু সহস্র ইহুদি ভারতবর্ষে এসে বসবাস করে। আরবদের দ্বারা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বহু সহস্র পারসিকও ভা নতে আশ্রয় পায়। ভারতে কেউ নিপীড়িত হয়নি। ইংরেজ মিশনারিদের প্রথম দলকে ইংরেজ সরকার জাহাজ থেকে ভারতে নামতে বাধা দিলে, শুনলে আশ্চর্য হয়ো না, একজন হিন্দুই মিশনারিদের হয়ে দরবার করে তাদের নামতে সাহায্য করেন। হ্যাঁ, দোষ আর কুসংস্কার আছে আমাদের, কার নেই? তবে এটা ঠিক, নানা দোষ ও কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা কখনো অন্যের উপর অত্যাচার করেনি। আর নানা দোষ ও কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুধর্মই বিশ্বজনীন মানুষের ধর্ম। আমি পূর্ব হতেই পূর্ণ, অনন্তকাল ধরে পূর্ণ, আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু—হিন্দু ছাড়া এ কথা কে বলতে পেরেছে? তোমার শক্তিতেই সূর্য আলো দিচ্ছে, সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে, পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠেছে। তোমার আনন্দেই পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসছে, পরস্পবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তুমিই সকলের মধ্যে সর্বস্বরূপ হয়ে আছ। কাকে ত্যাগ করবে? কাকে গ্রহণ করবে? তুমিই যে সমুদয়। হিন্দু ছাড়া এমন উচ্চতানে কে সুর ধরেছে?'

কিন্তু তোমাদের পুনর্জন্মবাদ? ওটা সম্বন্ধে কী বলবে?

'পুনর্জন্মবাদ ধর্মবিষয়ে আমাদের অনেক জিজ্ঞাসার একটা যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যার খুব কাছাকাছি যায়।' বলছে স্বামীজি, 'আমার বর্তমান অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্যে আমার একটি অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থায় অবশ্য বিশ্বাস করতে হবে। আমি যদি আমার ভাগ্য-

বিধাতা না হই তা হলে আমি স্বাধীন কোথায়? আমার বর্তমান জীবনের দুঃখের দায়িত্ব আমি নিজেই স্বীকার করি, অন্ধ নিয়তির উপর ছেড়ে দিই না, পূর্বজন্মে যে অশুভ সঞ্চয় করেছি এ জন্মে আমি তা ধ্বংস করব, ধ্বংস করে শুভতর কর্মে পুণ্যতর জীবনে প্রবেশ করব। আমার ক্রমাগত উন্নতি হবে আর এ উন্নতিই নিয়ে যাবে পূর্ণতায়। পুনর্জন্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি এইখানে।

কিন্তু তোমাদের স্ত্রীজাতির দুর্দশা—

যা দুর্দশা, দেখছ তা সামাজিক, তা প্রথাগত। কালধর্মে তার একদিন শোধন হবে। কিন্তু আমাদের আদর্শটা দেখ। বলছে বিবেকানন্দ। আমাদের আদর্শ সীতা, সীতাই মূর্তিমতী ভারতমাতা। পরমশুদ্ধস্বভাবা পতিপরায়ণা তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। ভারতে যা কিছু শুভ যা কিছু পবিত্র যা কিছু পুণ্যময় সীতা-নাম তারই পরিচায়ক। ভোগ করে শক্তি দেখানো নয়, সহ্য করে শক্তি দেখানো। এত দুঃখেও কখনো রামের উদ্দেশ্যে একটিও কঠিন বাক্য উচ্চারণ করেননি। চরম অবিচারেও বিক্ষুব্ধ হননি। এত বড় তিতিক্ষা আর কোথায় আছে? বুদ্ধ বলেছেন, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করলে সেই আঘাতের কোনো প্রতিকার হয় না, ওতে নতুন একটি পাপের শুধু সৃষ্টি হয়। সেই অসম্ভব উচ্চাদর্শই সীতার প্রকৃতিগত। আমাদের মেয়েরা এই সীতার—মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা। ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে আছে ভারতীয় নারী—গার্গী, মৈত্রেয়ী। আর পরমব্রহ্মচারিণী সারদামণির জুড়ি কোথায়? কী বলছে ম্যাক্সমুলার? 'শরীরসম্বন্ধ না রেখে ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করে ব্রহ্মচারী পতি যে পরম পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন এ দৃষ্টান্ত ইউরোপে নেই—একমাত্র হিন্দুতে আছে, রামকৃষ্ণে আছে।'

'কিন্তু জেনো আমি ধর্মপ্রচারক নই' বলছে বিবেকানন্দ, 'আমি

শুধু সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। আর এ সংগ্রাম আমার দেশব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। এ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হয় তার পথ খুঁজতে এসেছিলাম এখানে, পেয়েওছি সে পথ, কিন্তু আমার দেশবাসীরাই এ পথে কণ্টক আরোপ করছে। কিন্তু তবু আমার সেই দেশবাসীকেই আমি ভালোবাসি। আমার চরিত্রের যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, তবে সে আমার দেশপ্রীতি—গভীর দেশপ্রীতি।'

কিন্তু দেশপ্রীতিকে কর্মে রূপায়িত করা চাই। কিছু একটা করো পরহিতে, দেশহিতে। মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন ইট-পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের মত মরা ভালো। এ অনিত্য সংসারে দুদিন বেশি বেঁচেই বা লাভ কী? জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের মত অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যেও লড়াই করে মরা ভালো।

একবার চোখ খুলে দ্যাখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্যে কী হাহাকারটা উঠেছে! বিজ্ঞানের সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যেই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায়-চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কী করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্মতৎপরতা দিয়ে ঐহিক ভাব দূর না হলে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর, তারপর দেশের ইতরসাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে শেখা। আর বসে থাকবার সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে তা কে বলতে পারে?

দারিদ্র্যমোচনের ব্রত নাও। দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের

জন্যে জীবন বলি দাও। যারা দিন দিন ডুবছে তাদের উদ্ধারে সর্বস্ব নিয়োগ করো।

লণ্ডন ছাড়বার আগে সেভিয়ারকে বলছে স্বামীজি : আমার একমাত্র ধ্যান ভারতবর্ষ। আমার মন শুধু ভারতের দিকে ধাবমান।

'প্রায় চার বছর কাটালেন পশ্চিমে,' বললে সেভিয়ার, 'কাটালেন বীর্যবান ও সমৃদ্ধিমান সভ্যতার সঙ্গে, এখন কি আর নিজের দেশকে ভালো লাগবে? পদানত পরাধীন দেশ!'

'বলো কী!' গর্জে উঠল বিবেকানন্দ : 'যখন ছেড়ে আসি তখন সমস্ত দেশটাকেই ভালোবাসতাম একটা অনবচ্ছিন্ন ভাব-মূর্তিরূপে, এখন আমার দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালোবাসছি।'

মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড স্বামীজিকে জিগগেস করলে, 'স্বামীজি, আমি কী ভাবে আপনাকে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারি?'

স্বামীজি বললে, 'শুধু ভারতবর্ষকে ভালোবেসে।'

৫

ভক্ত বিবেকানন্দ

একটি ছ সাত বছরের বালক হারিয়ে গিয়েছে। কত খোঁজা-খুঁজি টোঁড়াটুঁড়ি, কোনো পাত্তা নেই। কত থানা-পুলিশ বিজ্ঞাপন এত্তেলা কোনো সুরাহা নেই। মা-বাপ পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। আহার নেই নিদ্রা নেই, উদ্বেগে-দুশ্চিন্তায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যমে নিলে হয়তো প্রবোধ ছিল। কিন্তু এ কী হল, কোথায় গেল?

ছ মাস পরে খবর পাওয়া গেল ছেলে পাওয়া গিয়েছে। এ জানলেই হল? ছেলে পাওয়া গিয়েছে, ব্যস, এইটুকু জেনেই তৃপ্তি? না, বাপ-মা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করবে, কোথায়, কোথায় পাওয়া গিয়েছে?

যে তোমার পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্যতর সমস্ত কিছুর চেয়ে প্রিয়, তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এটুকু জানলেই নিবৃত্তি হবে? সে কোথায়—একবারও জিজ্ঞাসায় উদ্বেল হয়ে উঠব না?

ছেলে পাওয়া গিয়েছে কোথায়? বসিরহাটে।

বসিরহাটে। শুধু এ জানলেই হবে?

না, হবে না। বসিরহাটে যেতে হবে। কবে যাবে? একবিন্দু সময় দেরি করবে না, তক্ষুনি-তক্ষুনি যাবে। পাঁজি-পুঁথি দেখবে না, মঘা-অশ্লেষা মানবে না, দুর্যোগ হলে দুর্যোগকে উপেক্ষা করবে। আর—যাবে কী করে? নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে নয়, মার্টিনের ছোট গাড়িতে টিকোতে-টিকোতে নয়, একটা বেগবান যান আশ্রয় করবে—একটা ট্যাক্সি নেবে।

বসিরহাটে পৌঁছুলেই কি হবে? ছেলেকে দেখল দাঁড়িয়ে আছে, শুধু দেখলেই কি হবে? না, হবে না। কী করবে? বাবা-মা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দুজনে কাড়াকাড়ি পড়ে

যাবে কে আগে বুকে টেনে নেবে! তারপর বুকে টেনে নিয়ে ছেলেকে আবেগে আশ্লেষে আঘ্রাণে চুম্বনে সমস্ত সত্তার সঙ্গে অনুস্যূত করে নেবে। গভীরে-প্রগাঢ়ে তন্ময় হয়ে থাকবে। তার পরে অন্য কথা, কোথায় ছিলি, কেমন ছিলি, কী করে কাটিয়েছিলি দিন-রাত্রি?

জ্ঞান—কর্ম—ভক্তি।

আগে জানো, তিনি আছেন। শুধু জানলেই চলবে না। বেগবান যান—বেগবান কর্ম আশ্রয় করে সেখানে গিয়ে পৌঁছোও। শুধু পৌঁছুলেও হবে না। আস্বাদে বিভোর ভরপুর হয়ে ওঠো।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কাঠের মধ্যে আগুন আছে এ জানলেই কি ভাত রান্না হবে? হবে না। আগে কাঠের লুকোনো আগুনটা বার করো। কী করে করবে? আরেকটা কাঠ নিয়ে এস। বেগে ঘর্ষণ করো। আস্তে-আস্তে ঘষলে হবে না। দ্রুত দীপ্ত কঠিন আঘাত করো। তারপর আগুন বেরুলে আগুনটাকে কাজে লাগাও। ভাতটা রান্না করো। রান্না করে বা কী হবে? শুধু ভাত দেখলেই কি পেট ভরবে? না, খাও, আস্বাদ করো। অন্নময় অমৃতময় হয়ে ওঠ।

এই আস্বাদই শেষ কথা। এই আস্বাদই ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান কর্ম ভক্তি। স্বামী বিবেকানন্দও জ্ঞান কর্ম ভক্তি। দুইই এক, একই দুই। শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্র, বিবেকানন্দ ভাষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বাক্য, বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্র, বিবেকানন্দ উচ্চারণ।

একই ভাব ধরেছেন দুইজনে। একই ভাব মানে দুই ভাব—অদ্বৈত আর দ্বৈত। অদ্বৈতে সোঽহং, দ্বৈতে দাসোঽহং, সন্তানোঽহং।

শ্রীগৌরাঙ্গেরও এই দুই ভাব। 'কখন ঈশ্বরভাবে প্রভু পরকাশ। কখনো রোদন করে বোলে মুঞি দাস।' কখনো হুঙ্কার

কখনো আর্তি। কখনো বিষ্ণুখট্টায় বসে, কখনো আবার ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। কখনো ঘোষণা করে আমিই সেই, কখনো আবার ভক্তদের গলা ধরে বলে, কিসে আমার কৃষ্ণে মতি হবে। কখনো নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করে, আবার কখনো দন্তে তৃণ ধরে দাস্যযোগ মেগে বেড়ায়।

গায়ক সা থেকে নি-তে ওঠে, কিন্তু নি-তেই অবস্থান করে না, আবার সা-তে নেমে আসে। সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে ছাদে ওঠে কিন্তু ছাদেই বসবাস করে না, আবার ঘরে নেমে আসে। সাধকেরাও নির্বিকল্পেই বুঁদ হয়ে থাকে না, আবার জীবভূমিতে বিচরণ করে। বিবেকানন্দকেও শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভূমিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানেই আবদ্ধ থাকতে দেননি, মর্তে লোক-সংসারে সেবা-প্রেমের মধ্যে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায়? জ্ঞান দাঁড়াবে ভক্তিতে, ভালোবাসায়। ঐ আমার মা—এই জেনে আমার লাভ কী, যদি আমি মা'র কোলে গিয়ে বসতে না পারি, যদি আমি কিছু না করতে পারি মা'র জন্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার দেখতে এসেছেন।

ঠাকুর বললেন, 'কাশি বড্ড বেড়েছে গো।'

ডাক্তার সরকার পরিহাস করে বললেন, 'কাশিতে যাওয়াই তো ভালো।'

'সে তো মুক্তি গো।' ঠাকুর বললেন, 'আমি মুক্তি চাই না, আমি ভক্তি চাই।'

কী ভক্তি? ইহলোক ও পরলোকের কামনা বর্জন করে ভগবানে চিত্ত অর্পণ বা তন্ময়তাই ভক্তি। ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি। সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। সা পরমপ্রেমরূপা। যে ভালোবাসা দিয়ে জগৎসংসারকে ঢেকে রেখেছি তা ঈশ্বরকে দিয়ে দেওয়ার নামই ভক্তি। ভক্তিই শ্রীপাদপদ্মবিষয়িণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি। অমলা ভক্তি। নিশ্চলা ভক্তি। বিশুদ্ধা ভক্তি। বিমুক্তা ভক্তি।

'নরেন বেশি আসে না।' ঠাকুর আক্ষেপ করছেন, নিজেই আবার নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছেন : 'তা ভালোই করে। ও বেশি এলে আমি বিহ্বল হয়ে যাই।'

আবার বলছেন, 'কাউকে কেয়ার করে না। আমাকেই কেয়ার করে না। কী গো, কী সব কথা হচ্ছে তোমাদের, জিগগেস করলুম সেদিন, আমাকে উড়িয়ে দিলে। বললে, বুঝবেন না, লম্বা-লম্বা কথা। দেখেছ তো কত বিদ্বান আমার নরেন, তবু আমার কাছে কিছু প্রকাশ করে না। পাছে লোকের কাছে বলে বেড়াই। মায়ামোহ নেই, একেবারে খাপখোলা তরোয়াল।'

সেই নরেন নিদারুণ কষ্টে পড়েছে। বাপ মারা গিয়েছে, সংসারে আর আয় নেই, রেখেও যায়নি কিছু। তাতে ঠাকুরের আবার কষ্ট। বলছেন, 'আহা, শুধু দুঃখ ভোগ করছে। কোনো উপায় হচ্ছে না। তা কী করা! ঈশ্বর কখনো সুখে রাখেন, কখনো দুঃখে রাখেন—'

নরেন আর রাখাল দুজনেই ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের সংকল্প নিয়েছে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে নরেন দেখল ঠাকুরের পিছু-পিছু রাখালও মন্দিরে চলেছে। বিগ্রহের সামনে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছেন, পিছু-পিছু রাখালও প্রণাম করছে।

দেখে গায়ের রক্ত মাথায় উঠল নরেনের। রাখালের এ কী বিশ্বাসভঙ্গ! কথা দিয়ে এসে সেই কথার বিপরীত!

রাখালকে ধরে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে নরেন ধমকে উঠল: 'এ তোমার কী কাণ্ড?'

'কেন, কী হয়েছে?' রাখাল হতভম্ব।

'কী হয়েছে মানে? এটা মিথ্যাচার নয়?'

'কোনটা ?'

'এই মন্দিরে গিয়ে দেবদেবী প্রণাম করা।'

রাখাল চোখ নামাল। কথা কইল না।

'তুমি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে সই করে দিয়ে আসোনি? বলে আসোনি নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু ভজনা করবে না? মানবে না দেবদেবী ?'

তবু চুপ করে রইল রাখাল। কী করে মনের কথা বোঝাবে নরেনকে ? ঠাকুরের ছোঁয়ায় সংস্কারের সব পুরোনো গ্রন্থি খুলে গিয়েছে। ব্রহ্মের যে ইতি নেই, তাঁর যে লেখাজোখা হয় না। তিনি যদি নিরাকার হয়ে থাকতে পারেন, সাকার হয়েই বা থাকতে পারবেন না কেন ? তিনি যদি সর্বাব্যাপক সর্বাবরক হন তবে তিনি শিলা-মৃত্তিকাই বা আশ্রয় করতে পারবেন না কেন ? গোঁড়ামির অন্ধকূপ থেকে ঠাকুর তাকে নিয়ে এসেছেন মুক্তবায়ুতে, আকাশের নিত্যনির্মল উদারতায়।

কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না রাখাল। এত যার তেজ ও দীপ্তি সেই নরেনের সঙ্গে রাখাল পারবে না তর্ক করে।

রাখাল চুপ করে থাকল বলে নরেন চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। সে সটান ধরল ঠাকুরকে।

'রাখাল এই মিথ্যাচার করবে? গড় হয়ে প্রণাম করবে দেবদেবী ?'

'করলেই বা।' শিশুর সারল্যভরা মুখে ঠাকুর বললেন, 'ভগবান সব জায়গায় আছেন, শুধু মূর্তিতেই থাকবেন না ?'

'কিন্তু ও যে সই করে দিয়ে এসেছে।'

'তাই বলে ও মত বদলাতে পারবে না ? চিন্তার জগতে ওর স্বাধীনতা থাকবে না ?'

চিরস্বাধীন নরেন্দ্রনাথ থমকে গেল। কথা খুঁজে পেল না।

'রাখালের এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে।' বললেন ঠাকুর, 'তা

কী করবে বলো ? যার যেমন ধাত। যার যেমন পেটে সয়। তোর নিরাকারের ঘর, রাখালের সাকারের। তোর জ্ঞানের ঘর, রাখালের ভক্তির। সকলেই কি আর গোড়া থেকে নিরাকারে মন দিতে পারে ? সাকার-নিরাকার যে কোনো একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল।'

সকলেই কি আর জ্ঞানে প্রদীপ্ত হতে পারে ? কিন্তু ভক্তিতে মধুর কে না হতে পারে বলো ?

'আজ্ঞে ভগবানের দয়া হবে নরেনের উপর।' ত্রৈলোক্য সান্যাল ঠাকুরকে আশ্বাস দেবার জন্যে বললে।

'আব কখন হবে !' ঠাকুর অভিমানভরা স্বরে বললেন, 'তবে কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়িতে কেউ অভুক্ত থাকে না। কিন্তু যাই বলো কারু কারু সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।' নরেন কাছেই ছিল, তার দিকে তাকালেন ঠাকুর।

নরেন বলে উঠল : 'আমি নাস্তিক মত পড়ছি।'

যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই তো নাস্তিক। যে আত্ম-শক্তিতে দৃঢ়চিত্ত তার নাস্তিক্য কোথায় ?

'কিন্তু ভগবান তো ভক্তকে দেখবেন।' সুরেন মিত্তির বললে, 'নইলে তাকে ন্যায়পরায়ণ বলি কী করে ?'

'সেই তো মায়া।' বললেন ঠাকুর, 'ঈশ্বরের কাজ বুঝি এমন আমাদের সাধ্য কী ! ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে, পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছে। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে, খানিকক্ষণ পরে দেখে, ভীষ্ম কাঁদছে। কী আশ্চর্য, পাণ্ডবেরা প্রশ্ন করল কৃষ্ণকে, পিতামহ অষ্টবসুর এক বসু, এঁর মত জ্ঞানী দেখা যায় না। ইনিও মৃত্যুর মায়াতে কাঁদছেন ? তারই জন্যে কী ? জিগগেস করো ভীষ্মকে। জিগগেস করাতে ভীষ্ম বললে, কৃষ্ণ, ঈশ্বরের কাজ কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন সেই পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই। যখনই এই কথা ভাবি তখনই কাঁদি। এই ভেবে কাঁদি ঈশ্বরের কার্য বোঝবার জো নেই—'

তবু, অভ্যাসবশেই, সকালে ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম করে নরেন।

পাশের ঘর থেকে একদিন শুনতে পেলেন ভুবনেশ্বরী, নরেনের মা। কেমন যেন অসহ্য লাগল। বলে উঠলেন, 'চুপ কর। ছেলেবেলা থেকেই তো কত ভগবান ভগবান করলি—ভগবান তো সব করলেন!'

বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল নরেন। সর্বংসহা যে মা, সহিষ্ণুতার প্রতিমা, তিনিও অস্থির হয়েছেন। ভগবান তাঁর কান্নাও কানে নেননি। তবে তাঁকে করুণাময় বলি কী করে? যিনি কল্যাণ করেন শুনেছি তিনি একটু করুণা করতে পারেন না?

দরকার নেই, চাইনে করুণা। নোয়াব না মাথা, নিজের পায়ে দাঁড়াব। লড়ব আর মরব। কাউকে কেয়ার করি না।

এই যে নিশ্বাসটুকু ফেলছিস এই তো ঈশ্বরের করুণা। এই যে চোখ মেলে দেখছিস সমস্ত কিছু, বিশ্বসংসারটা রঙে-রূপে ঝলমল করছে, এইটেই বা কার কারিগরি? তোর নিজের কর্তৃত্বের? মনে যে তোর এই বোধ এই অনুভূতি এই জিজ্ঞাসা এটাই বা কার রচনা, কার কৌশল?

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভুবনেশ্বরী।

মাও তা হলে ছাড়তে পারেননি ঠাকুরঘর। এত তিক্ত বিরক্ত হবার পর আবার একটু উপশমের আশায় বসেছেন নিভৃতে।

ভুবনেশ্বরীর পরনের চেলিটি শতচ্ছিন্ন। এমনিতে হয়তো বলতেন না, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়াতে বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ রে বিলে, আমাকে একখানা চেলি কিনে দিতে পারিস?'

কোত্থেকে কিনে দেবে? সংসার উপবাসের উপকূলে বাস করছে, এ সময় কিনা মা'র চেলির বিলাসিতা! নরেন মাথা হেঁট করে চলে গেল ম্লানমুখে।

কদিন পর কী মনে করে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর। বিকানিরের এক ভক্ত মাড়োয়ারি ঠাকুরকে এক থালা মিছরি ও একখানা গরদের কাপড় উপহার দিয়েছে। নরেনকে দেখে ঠাকুর মহাখুশি। বললেন, 'নরেন এসেছিস? তুই এই গরদখানা নিয়ে যা।'

'সে কী? আমি নেব কেন?' নরেন থমকে গেল।

'তোর মাকে দিবি।'

'মাকে দেব কেন?'

'তোর মা'র চেলিখানা ছিঁড়ে গিয়েছে,' ঠাকুর কুণ্ঠিত হয়ে বলছেন, 'আহ্নিক করতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে, এ গরদখানা পরে আহ্নিক করবে।'

'আমার মা'র চেলি ছিঁড়ে গিয়েছে এ আপনি কী করে জানলেন?'

ঠাকুর অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাব করে, বলতে চান না এমনি সঙ্কোচ দেখিয়ে বললেন, 'ও আমি জানতে পারি।'

নরেন দৃঢ়স্বরে বললে, 'মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি অর্জন করে দেব। আমি তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে নেব কেন? না, নেব না ভিক্ষে।'

নরেন প্রত্যাখ্যান করলে।

নরেনের তেজ দেখে ঠাকুর মহাখুশি। চলে গেলে বললেন, 'আমরা হচ্ছি নর আর ও হচ্ছে নরের মাঝে ইন্দ্র। কিন্তু জিগগেস করি শুধু কর্মযোগের ঔদ্ধত্যে কি হবে যদি আমি আমার কৃপা না মিশ্রিত করি?' রামলালকে ডাকলেন, বললেন, 'ও রামনেলো, তুই কাল ঠিক দুপুরবেলা গৌরমুখুজ্জের লেনে গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকবি। নরেন বেরিয়ে গেলে ঢুকবি বাড়িতে, গরদখানা ভুবনেশ্বরীকে পৌঁছে দিবি, বলবি, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখিস নরেনের সামনে যেন পড়ে যাসনে। নরেন যেন না টের পায়।'

যথাদিষ্ট রামলাল ভুবনেশ্বরীর হাতে গরদখানা পৌঁছে দিল। বললে, 'ঠাকুর আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

ভুবনেশ্বরীর চোখে জল এসে গেল। বললেন, 'আমি এখানে কী বললাম আর তা টেলিগেরাপে দক্ষিণেশ্বর জেনে ফেললেন।'

শুধু জেনে ফেললেন না, ব্যবস্থা করলেন, পৌঁছিয়ে দিলেন। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং।'

আমি কেন প্রার্থনা করতে যাব? আমি নিজেই ঈশ্বর।

ঈশ্বর যেমন তোমার ভিতরে তেমনি আবার তোমার বাইরে। তোমার ভিতরের ঈশ্বর পুরুষকার, বাইরের ঈশ্বর কৃপা। বাইরের ঈশ্বরের কাছে, কৃপার কাছে প্রার্থনা করো, আমার পুরুষকারকে জাগ্রত করো। আবার পুরুষকার না জাগলে কৃপা জাগবে কী করে? তাই—তাই দুইই চাই। কর্মও চাই কৃপাও চাই। তেলও চাই পাত্রও চাই। বীজও চাই বৃক্ষও চাই। যোগও চাই যুদ্ধও চাই।

মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ।

শুধু কর্মযোগের আস্পর্ধায় হবে না, একটু প্রার্থনা করো। তোমার কর্ষণের মধ্যেই তো বর্ষণ নেই। চাষ করো আর প্রার্থনা করো, হে মেঘ, জল, দাও। চোখ মেললেই তো আর দেখতে পাও না যদি তিমিরহরণ আলোটি না জ্বলে। তাই চোখ মেল আর প্রার্থনা করো, হে আলোকময়, আলোটি দাও, আলোটি জ্বালো। শুধু অর্জুনে হবে না, কৃষ্ণকে ডাকো। শুধু কৃষ্ণেও হবে না, অর্জুন কোথায়?

'আপনার মাকে একবারটি বলুন।' নরেন গিয়ে ধরল ঠাকুরকে।

'কী বলব?'

'মা-ভাই বোনের কষ্ট আর দেখতে পারি না। ওদের কষ্টের যাতে লাঘব হয়, আমার একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি হয়, আপনার মা'র কাছে একটু সুপারিশ করুন।'

ঠাকুর তাকালেন স্নিগ্ধ চোখে। বললেন, 'আমার মা, তোর কে?'

'আমার কে না কে তাতে কী আসে যায়?' নরেন বললে, 'আপনার মা আপনি বলুন।'

'ওরে ওসব বিষয়কথা বলতে পারি না।'

'ওসব বাজে কথা ছাড়ুন।' নরেন নাছোড়বান্দার মত বললে, 'আপনাকে বলতেই হবে। নইলে ছাড়ব না কিছুতেই।'

ঠাকুরের চোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে জানিস না কতবার বলেছি তোর হয়ে। বলেছি, মা, নরেনের দুঃখকষ্ট দূর কর। নরেনকে টাকা দে।'

'বলেছেন? আজ একবার বলুন আমার সামনে—'

'ওরে তুই গিয়ে বল। কাছে বসে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসে না।'

'সেইজন্যেই তো কিছু হয় না। সেইজন্যেই তো তোর এত কষ্ট। তুই মাকে মানিস না বলে মা আমার কথাও শোনেন না। বলেন, যার দুঃখ সে বলে না কেন? সে বলতে পারে না? শোন, আজ মঙ্গলবার। রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তারপর যা চাইবি মা'র কাছে মা দিয়ে দেবেন। লুট করেও মা'র ভাণ্ডার শেষ করতে পারবিনে।'

'সত্যি?'

'তুই দ্যাখই না চেয়ে।'

মন্দিরে ঢুকে নরেন কী দেখল তা কে জানে। পুত্তলিকা না পাষাণপ্রতিমা, না, অখিল জগতের জননী, করুণাবরুণালয়া, দয়ার্দ্র-হৃদয়া।

তিন তিনবার ঢুকল মন্দিরে। প্রথমবার, কী চাইবে, কী আশ্চর্য, ভুল হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার কী রকম ভেবড়ে গেল, কী চাইবে মুখে জুটল না। তৃতীয়বার? তৃতীয়বার চাইতে লজ্জা হল।

এই প্রেম ও প্রসন্নতার নির্ঝরিণী পরমার্তিহন্ত্রী অখিলেশ্বরীর কাছে হীনবুদ্ধির মত কী তুচ্ছ লাউকুমড়ো চাইব!

'আর কিছু চাই না মা,' নরেন ভবতারিণীর সামনে প্রণত হয়ে পড়ল। 'আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।'

বাইরে এসে ঠাকুরকে বললে, 'আমায় মা'র গান শিখিয়ে দিন।'

'কোনটা শিখবি?'

'মা, ত্বং হি তারা—সেই গানটা।'

ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন :

'মা, ত্বং হি তারা, ত্রিগুণধরা পরাৎপরা
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমিই আদ্যমূলে গো মা
আছ সর্বঘটে অঙ্গপুটে, সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা॥'

সারারাত ধরে ঐ গান গাইল নরেন। ঘুমুতে গেল না। শুধু ত্বং হি তারা—

পরদিন, বেলা বেড়ে গেছে, তবুও নরেন ঘুমুচ্ছে। বৈকুণ্ঠ সান্যাল এসেছে। নরেনের সঙ্গে আলাপ নেই। কে একটা জোয়ান ছোকরা, প্রায় দুপুর পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে, খুবই আপত্তিকর মনে হল। বললে, 'এখনো ঘুমুচ্ছে যে।'

'কাল সমস্ত রাত মা'র গান গেয়েছে। আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে। মা'র কাছে টাকাকড়ি চাইতে গিয়েছিল, চাইতে পারল না, চাইতে লজ্জা করল।' ঠাকুর আনন্দ করতে-করতে বলতে লাগলেন : 'বললে ফলফুল দিয়ে আমার কী হবে? মা তোকেই চাই। তাই গান শিখে নিয়ে গাইলে সমস্ত রাত—তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোহরা। কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে, বেশ হয়েছে—তাই না?'

বৈকুণ্ঠ সায় দিল : 'বেশ হয়েছে।'

আনন্দ করতে লাগলেন ঠাকুর : নরেন কালী মেনেছে, মা মেনেছে—বেশ হয়েছে। কেমন, তাই না?

কিন্তু সারদামণি, মাঠাকরুন কী চাইলেন?

মাঠাকরুনের ভাইঝি মাকু মাকে জিগগেস করলে, 'ঈশ্বরের কাছে কী চাইব, কী চাইবার আছে?'

জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য—নরেন্দ্রনাথ যা চেয়েছিল, তাও নয়, মাঠাকরুন বললেন, 'যদি কিছু চাও, যদি কিছু চাইবার থাকে, তা হচ্ছে নির্বাসনা। আমি কিছু চাই না এই আমি চাই।'

সারদামণি নিজেই নির্বাসনার প্রতিমূর্তি। নির্বাসনায় নির্বাসিতা।

কিছু চাই না, তবু তোমাকে ভালোবাসি এই হচ্ছে সমর্থতমা রতি। অহেতুকী, অনিমিত্তা ভক্তি। গোপীভক্তি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্যে স্বামী পুত্র গৃহ কুল স্বজন ভবন ইহকাল পরকাল সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, ছিন্ন করেছে দুর্জরগৃহশৃঙ্খল—আর এই অনপায়িনী অব্যভিচারিণী ভক্তিতেই লাভ করেছে কৃষ্ণকে। উদ্ধবকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'ঐ গোপবালাদের কী সম্বল ছিল? তারা না বুঝেছে আমার তত্ত্ব, না বুঝেছে আমার স্বরূপ। তাদের একমাত্র ধন ভক্তি। তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সব ছেড়ে একনিষ্ঠ ভক্তিতে শরণ নাও, তা হলেই তুমি নির্ভয় তুমি পূর্ণকাম।'

কোথায় বনচরী গোপী, কোথায় শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চল স্নেহ। কিন্তু বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। না জেনে খেলেও ওষধিশ্রেষ্ঠ অমৃত তার কাজ করে। পাত্রাপাত্র বিচার নেই, জ্ঞান-অজ্ঞান বিচার নেই, ভক্তি হলেই ফল ফলবে।

দ্বারকায় কৃষ্ণের অসুখ করেছে। এ রোগের চিকিৎসা কী, জিগগেস করল নারদ। কৃষ্ণ বললে, কোনো ভক্ত যদি তার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দেয়, ভালো হতে পারি। যে নারদ এত বড় ভক্ত, সেও পিছু হটল। কৃষ্ণের মহিষীদের প্রত্যেকের কাছে

গিয়ে হাত পাতল। সে কী কথা? স্বামীকে কী করে পায়ের ধুলো দেব? তাতে আমাদের পত্নীধর্ম নষ্ট হবে না? না, পারব না ধুলো দিতে। নারদ তখন ব্রজে গেল। ব্রজাঙ্গনারা চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের কৃষ্ণের অসুখ? আমরা কি তার ভক্ত? আমাদের ধুলোতে কি কাজ হবে? তবু আমাদের কৃষ্ণ যদি ভালো হয়, দেব আমাদের পায়ের ধুলো. যদি পাপ হয়, অধর্ম হয় তো আমাদের হবে। আমাদের পাপে আমাদের অধর্মেও যদি কৃষ্ণ সুখী হয়, আমরা সে পাপ সে অধর্ম করব হাসিমুখে। জীবনে আর আমাদের ব্রত কী? সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করাই আমাদের ব্রত।

ভক্তিই শক্তি। ভক্তিমানই শক্তিমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সে সম্ভোগে সুখ কোথায়, যে সম্ভোগে নিশ্চিন্ততা নেই? সব সময়ে উদ্বেগ, সব সময়ে দুশ্চিন্তা—সুখ কোথায়? কোথায় কী গেল, কোথায় কী হারালো, কোথায় কী হল না, কোথায় কী এল না, সব সময়েই হা-হুতাশ—সুখ কোথায়? আমাদের শুধু সুখী হলে চলবে না, আমাদের নিশ্চিন্ত হতে হবে। এ সংসারে নিশ্চিন্ত কে? একমাত্র ভক্ত নিশ্চিন্ত। একমাত্র মায়ের কোলে চড়ে বসা শিশু নিশ্চিন্ত।

হ্যাঁ রে, জীবনে এত রোমাঞ্চ খুঁজছিস, বেগের রোমাঞ্চ, ভোগের রোমাঞ্চ, নিষেধের রোমাঞ্চ—একবার মায়ের কোলে চড়ে বসা নির্ভর্ষণ নিষ্কিঞ্চন শিশু হবার রোমাঞ্চ নিবিনে? কণ্টকিত বৃন্তে পুষ্পায়িত হবার রোমাঞ্চ? ছেড়ে দিবি? ঠকে যাবি?

না, ছাড়ব না, ঠকব না। প্রতি রোমকূপে নিয়ে যাব সেই শিহরন।

আরেক নিশ্চিন্ত পুরুষ বিবেকানন্দ।

শিকাগো স্টেশনে খোলা ইয়ার্ডে একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে কুঁকড়ি-সুঁকড়ি হয়ে শুয়ে আছে। শীতের রাত। তা হোক, এই

ভাবেই কাটাবে, ঘুমিয়ে কাটাবে। আশ্রয় নেই, আহার নেই—তাই বলে ভয় বা নৈরাশ্য বলেও কিছু নেই। সমস্ত অন্ধকারে যিনি দীপপ্রদ উপস্থিতি সেই শ্রীরামকৃষ্ণই আছেন তাঁর শিয়রে। শ্রীরামকৃষ্ণই তো মা, মায়ের কোল। সমস্ত বিপদে আশ্বাস, সমস্ত ব্যাধিতে ওষধি, সমস্ত আঘাতে উপশম। এক তন্তু দুশ্চিন্তার কুয়াশা নেই কোথাও, মায়ের কোলে শুয়ে আছে, পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

এত ঘুমুল যে পরদিন সকালে রোদ উঠলে স্টেশনের কুলি তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিল।

কোথায় যাবে ঠিক নেই। একটা হোটেলের ঠিকানা পর্যন্ত কেউ দেয় না। সরাসরি ভিক্ষে করতে বেরুল। নিশ্চিন্ত—নিরাসক্ত। যা হবার হবে। বক্তৃতা দিতে পারি দেব, না পারি দেব না। শ্মশান-ভবন সব সমান। আমি একজন ভালো লোকের উপর, আমার মা'র উপর, বিশ্বাস স্থাপন করে আছি, মা কি কখনো তার সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে?

বারেবারে ছিন্ন করলেও ইক্ষু মধুস্বাদু। বারেবারে ঘর্ষণ করলেও চন্দন চারুগন্ধ। বারেবারে দগ্ধ হলেও কাঞ্চন কান্তবর্ণ। বারেবারে বিপন্ন হলেও ভক্ত ভক্ত, সন্তান সন্তান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, পাথর হাজার বছর জলে পড়ে থাকলেও তার মধ্যে জল ঢোকে না, আর সামান্য মাটির ঢেলার গায়ে একটু জল লাগলেই তা গলে যায়। যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত তারা হাজার-হাজার আপদ-বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের মন সামান্য কারণে টলে যায়। চকমকির পাথর শত বছর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মারা মাত্র আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত হাজার-হাজার অপবিত্র সংসারীর ভিতর পড়ে থাকলেও তার বিশ্বাস-ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। যার গলা একবার সাধা হয়েছে তার সুরে শুধু সারেগামা এসে পড়ে।

ভক্তিই সুলভ, স্বতন্ত্র, স্বসম্পূর্ণ। ভক্তির সাধনে কিছুই লাগে না, না জ্ঞান না বৈরাগ্য না অন্যতর অনুষঙ্গ। পরমপ্রেমময়ী তৃষ্ণা, ইষ্টে গাঢ় আবিষ্টতা—তারই নাম ভক্তি। ভক্তি দিয়েই শুধু জানা যায়, দেখা যায়, প্রবেশ করা যায় তত্ত্বে, স্বরূপের উদ্‌ঘাটনে। ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবংবিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥

'ভক্তেরও একাকার বোধহয়।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'সে দেখে তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। অনেক পিত্ত জমে যখন ন্যাবা লাগে তখন সবই হলদে দেখে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে তখন তার নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। ভক্তি থেকেই প্রেমে উত্তরণ।'

প্রেমের ভাব কী? হে প্রভু, হে কৃষ্ণ, তোমার জন্যে সব ছাড়তে পারি—অষ্টপাশের শেষ পাশ লজ্জা পর্যন্ত। আর আমার ইচ্ছা শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা। আমার তৃপ্তি কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী। আমি আমার নিজের জন্যে কিছু চাই না, শুধু তোমার ভালো হোক, তোমার কুশল হোক, তুমি সুখী হও, তুমি প্রীত হও। 'মথুরা-নগরে ছিলে তো ভালো, দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। সে সব দুখ কিছু না গনি, তোমার কুশলে কুশল মানি॥' শীতে কী করল গোপী? গায়ের উত্তরীয় কৃষ্ণকে দিয়ে নিজে রইল রিক্তগাত্রে। কৃষ্ণ যদি উত্তাপে থাকে তা হলে আর আমার শীত কোথায়?

অদ্বৈতজ্ঞানের তুঙ্গতম শৃঙ্গ থেকে বিবেকানন্দও নেমে এল দ্বৈত ভূমিতে—ভক্তিতে—সখ্যে, মধুরে, দাস্যে। শঙ্করাচার্যকেও নেমে আসতে হয়েছিল। 'সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ।' 'নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।' 'ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী।' 'প্রসীদ ত্বং মাতঃ গুণরহিতপুত্রে অধিকদয়া।' 'নিরালম্ব-লম্বোদরজননী কং যামি শরণম।' 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।'

লণ্ডন থেকে আমেরিকায় ফ্রান্সিস লেগেটকে চিঠি লিখছে স্বামীজি: 'তুমি জেনে সুখী হবে আমি ক্রমশই সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতিতে উপনীত হচ্ছি। উদ্ধত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও মনে হয় আমি দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরকে। যেভাবে এগুচ্ছি, মনে হয়, শয়তান বলে যদি কেউ থাকে তা হলে তাকে পর্যন্ত ভালো-বাসতে পারব।'

আমার যখন কুড়ি বছর বয়স তখন আমি ভীষণ গোঁড়া ছিলাম, আমার যারা বিরুদ্ধে ছিল তাদের সঙ্গে বনিয়ে চলা দূরের কথা, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। কলকাতার রাস্তায় যে ফুটপাথে থিয়েটার দাঁড়িয়ে, সেই ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতাম না। আমার এখন তেত্রিশ বছর বয়সে গণিকাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি, তাদের প্রতি একটাও কটু কথা বলবার কথা ভাবতে পারি না। আমি কি অধঃপাতে যাচ্ছি, না, কি আমি পরমপ্রেমস্বরূপ ভগবানে বিকশিত হচ্ছি? শুনেছি মানুষ যদি তার চারপাশে পাপ না দেখতে পায় তা হলে সে মহৎ কাজ করতে পারে না—সে অদৃষ্টনির্ভর নিশ্চেষ্টতায় থেমে থাকে। আমার তো তা মনে হয় না। আমার তো মনে হয় এই প্রেমানুভব আমাকে দীপ্ততর দীর্ঘতর কর্মে প্রেরিত করছে। কোনো কোনো দিন আমি এক আনন্দিত অবস্থায় এসে উপনীত হই। ইচ্ছে হয় সকলকে ও সবকিছুকে আশীর্বাদ করি, ভালোবাসি, বুকে জড়াই। দেখি, মন্দ ভুল, পাপ ভুল। বলতে কি, ফ্রান্সিস, আমি এখন অমনি সেই আনন্দ-আবেশে আছি, আমার প্রতি তোমার ও তোমার স্ত্রীর দয়া ও ভালোবাসার কথা ভেবে আমি কাঁদছি, আনন্দে চোখের জল ফেলছি। ভাগ্যিস জন্মগ্রহণ করেছিলাম। জন্মদিনকে শুভবন্দনা জানাই। আমি আমার অনন্ত প্রেমস্বরূপের হাতের একটি খেলনা—তাঁরই সেবায় আমি আমার সর্বস্ব ছেড়েছি, ছেড়েছি আমার প্রিয়জনদের, ছেড়েছি

সুখের আশা, জীবনের মায়া। সেই আমার লীলাসঙ্গী, আমি তার খেলুড়ে। তার সৃষ্টির কোনো কারণ নেই, উদ্দেশ্য নেই। খালি তার খেলা, তার খামখেয়াল। ভীষণ মজা, তার খেলাভরা হাসি-কান্নার রঙমহল।

দু-একটা জিনিস শুধু বুঝেছি। বুঝেছি, ভাব আর ভালোবাসা আর ভালোবাসার ধন সমস্ত যুক্তি, বিদ্যা ও বাক্যের বহুদূরে। হে সাকি, পেয়ালা ভরতি করো আর আমরা পাগল হয়ে যাই।

এ আরেক বিবেকানন্দ। এ বিবেকানন্দ মধুর, মধুরের অনুগত।

হিমালয়ের পথে যাচ্ছে স্বামীজি, সঙ্গে নিবেদিতা। পার্বতী নদী আর নির্ঝরিণীতে জলের শব্দ হচ্ছে।

'আওয়াজ কী বলছে জানো?'

'কী?' নিবেদিতা দাঁড়াল স্থির হয়ে। কান খাড়া করে।

'শোনো, ভালো করে শোনো।' স্বামীজি বললে, 'বলছে হর হর বম বম। হ্যাঁ, অনাদি অনন্ত শিবধ্বনি। শিব—মহেশ্বর, শান্ত, মৌন, সুন্দর। জানো আমি শিবের পরম ভক্ত।'

অমরনাথ দেখে এল।

বললে, 'হ্যাঁ, আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানতে পারিনি। মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গিয়েছিলাম।'

'পায়রা দেখেছিলেন—শাদা পায়রা?' শিষ্য জিগগেস করলে, 'শুনেছি শাদা পায়রা দেখলে নাকি বোঝা যায় সত্য সত্য শিবদর্শন হল।'

'দেখেছিলাম তিন-চারটে শাদা পায়রা। গুহায় থাকে না কাছাকাছি পাহাড়ে থাকে কে বলবে।'

নিবেদিতাকে বললে, 'ঐ গুহায় অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছেন।'

অমরনাথ থেকে এল ক্ষীরভবানী।

বললে নিবেদিতাকে, 'আগে শিব মাথায় চড়েছিল, এখন মাকে দেখছি যেন ঘরের মধ্যে আছেন, চলাফেরা করছেন—'

'এই ঘরের মধ্যে?'

'হ্যাঁ, আর কথা বলছেন।'

ঘুমুতে পাচ্ছে না, বিশ্রামে রুচি নেই—সর্বক্ষণ সমস্ত চিন্তা সমস্ত উন্মুখতা সেই অশরীরী মাতৃবাণীর সন্ধানে। এও এক নিদারুণ যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা ছাড়া বুঝি অন্ধকারকে বিদীর্ণ করবার উপায় নেই।

'কে মা?' জিসগেস করল নিবেদিতা।

'এ আমার ভয়ঙ্করী মা। ভীমা মা।' বলে উঠল বিবেকানন্দ: 'তিনিই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রণা। তিনিই যন্ত্রণাদাত্রী। কালী! কালী! কালী!'

অমরনাথ মহাদেবকে মুখোমুখি দর্শন করে এসে এ আবার কী আকৃতি! কী প্রার্থনা!

'বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে।
কি সুখে হাসিছে, লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে
ঘোর সমরে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে॥
কারে আর ভজ রে, ও পদে মজ রে
রূপে আলো করেছে দিগ্‌দশে
কি করি রণে রে, হরেছে মনে রে,
প্রসাদ ভনে রে, চল কৈলাসে॥'

কিছু একটা লেখবার উত্তেজনা, উদ্দাম উত্তেজনা, পেয়ে বসল স্বামীজিকে। দুর্বার আবেগে Kali The Mother কবিতা লিখে ফেলল ইংরিজিতে। মা আমার আয়, যদিও তুই ভয়ঙ্করী প্রলয়রূপিণী, তবু তুই আয়, আমার সামনে এসে দাঁড়া। তুই

মৃত্যুরূপা, তাই তুই মাতৃরূপা। কিন্তু মৃত্যুরূপা মা কার কাছে আসে, কোন বীরবিক্রম সন্তানের কাছে ?

'কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে॥'

লেখা শেষ করেই আবেশতন্ময় স্বামীজি পড়ে গেল মেঝের উপর।

'আমার সঙ্গে কেউ এসো না।' স্বামীজি একা-একা চলে গেল ক্ষীরভবানী দর্শন করতে। জলরূপিণী দেবী—ক্ষীরভবানী। বিচিত্রবর্ণা।

সেখানে সাতদিন ক্ষীরভবানীর পুজো করল। হোম করল। প্রতিদিন এক মন দুধের ক্ষীর ভোগ দিল।

এখন আর শিব-শিব নয়, হরি ওঁ নয়, এখন শুধু মা।

কদিন পরে নিবেদিতাদের হাউসবোটে দেখা করতে এল স্বামীজি। হাতে ক'টি গাঁদা ফুল। নিবেদিতা ও তার সঙ্গিনীদের মাথায় রাখল ফুলক'টি। কাছে বসল। বললে গভীর গদ্গদকণ্ঠে, 'আর হরি ওঁ নয়। এখন শুধু মা।'

হৃদয় থেকে সমস্ত সংগ্রামের প্রেরণা যেন তখন চলে গিয়েছে, এখন যেন মায়ের কোলে সর্বসমর্পণের বাসনা। বললে, 'আমার দেশপ্রেমও কোথায় চলে গিয়েছে। কিছুই যেন থাকছে না। এখন শুধু মা, কেবল মা।

আবার সেই কথা মনে করো। সারদামণিকে বলেছিল নরেন, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।'

সারদামণি স্নিগ্ধমুখে বললেন, 'দেখো আমাকে যেন উড়িয়ে দিও না।'

'তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায় ?' নরেন বললে, 'যে

জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায়?'

গুরুপাদপদ্মই ভক্তি। ভক্তি ছাড়া জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায়? জ্ঞানবৃক্ষ যে পল্লবিত হচ্ছে ভক্তিফল ধরবে বলে। জ্ঞান নৌকো, ভক্তিই তার বন্দর।

স্বামীজি আবার বললে, 'আমার মনে হয় আমি এখন এক নিশ্চিন্ত শিশু, মার কোলের উপর বসে আছি আর মা আমাকে আদর করছেন।'

এই একেবারে হুবহু শ্রীরামকৃষ্ণ। অদ্বৈতচূড়া ছেড়ে এসে মায়ের কোল! মায়ের চুম্বন!

মা'র কোলের বাইরে অকূল বলে কিছু নেই। তাই কোলে রাখলেও মা, ফেলে রাখলেও মা। ঘুম পাড়িয়ে রাখলেও মা, জাগিয়ে তুলে দিলেও মা। আর সন্তান—শান্ত হলেও সন্তান, দুরন্ত হলেও সন্তান। গুণবান হলেও সন্তান, অকৃতী অধম হলেও সন্তান।

থেকে-থেকে কালীর গান গাইছে। আর সবসময়েই সেই কালী, যে তার পূজকের বুকের উপর, হৃৎপদ্মের উপর, পা রেখেছে!

যেদিন দেহ ছেড়ে দেবে সেদিনও স্বামীজির কণ্ঠে মা'র গান: মা কি আমার কালো রে! বললে, 'সন্দেহ কী, শ্রীরামকৃষ্ণই কালী। আর আমার ব্রহ্মও কালী হয়ে দাঁড়াল! কালী! কালী!'

মা-মা করো। বলছেন ঠাকুর, ঈশ্বরকে মা বলে ডাকো। মা-ই নাবালকের অছি। যদি কারু উপর জোর চলে একমাত্র মায়ের উপর। ঈশ্বরকে মা বলে ডাকলেই শিগগির ভক্তি হয়, ভালোবাসা হয়। মা ডাকে কখনো শুষ্কতা লাগবে না, অরুচি ধরবে না। আরো, সব চেয়ে সুবিধে, কিছু প্রার্থনাও করতে হয় না মা'র কাছে। মা বলে ডাকলেই মানুষ নিমেষে পবিত্র হয়ে যায়।

চোখে জল আসে—অমল অশ্রু। অহঙ্কারের শেষ ধুলোকণা পর্যন্ত ধুয়ে যাবে। ঘুচে যাবে দোষদৃষ্টি। সমস্ত কিছুতেই মাকে দেখবে—দেখবে মা'র প্রসন্নতা। যন্ত্রণাও প্রসন্নতা।

মাকে ডাকো। মা বলে ডাকো। মা বলে ডাকলেই মনে হবে যেন পাশের ঘরে আছেন, আসবেন ব্যাকুল হয়ে। যদি রান্নাঘরেও থাকেন, ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে, ছুটে চলে আসবেন কোলে নিতে। মায়ের জন্যে কাঁদো, বালিশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদো, দেখি কেমন তাঁর উপশমভরা উষ্ণবক্ষে তোমাকে তুলে না নেন।

কিন্তু কে, কে জগজ্জননী মাকে, কালীকে মা ডাকতে পারে? যে তার নিজের মাকে ভালোবেসেছে, যে তার নিজের মায়ের জন্যে কেঁদেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখ। সে মাতৃভক্তির তুলনা নেই ত্রিভুবনে। সন্ন্যাসী হয়েও যিনি মাকে ছাড়েন নি। প্রত্যহের প্রথম প্রণাম রেখেছেন মা'র পায়ে। আগে চন্দ্রামণি পরে ভবতারিণী। ঐ যে বুকের উপর কোঁচার খুঁটটুকু তোলা, সে তোতাপুরীর থেকে সন্ন্যাস নেবার সময় পৈতে ফেলে দিয়েছিলেন বলে, পাছে রিক্ত-নগ্ন বুক মায়ের চোখে পড়ে, পাছে মা দুঃখ পান। যতদিন মা জীবিত ছিলেন মা'র কাছে বসে খেতেন। বৃন্দাবনে গেলেন শ্রীমতীর সাধন করতে, মায়ের মুখখানি মনে পড়তেই 'ঈশ্বর-ফিশ্বর' সব ভুল হয়ে গেল। ফিরে এলেন মা'র কাছে দক্ষিণেশ্বরে। তারপর মা মারা যাবার পর মায়ের দুটো বুড়ো আঙুল ধরে এই বলে কাঁদলেন, মা, আমি তোমার হতভাগ্য সন্তান। কে কাঁদছে, নিজেকে হতভাগ্য বলছে? আর কেউ নয়, সাধকচক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ। হেন সাধন নেই যিনি করেননি—নির্বিকল্প থেকে ধৌতিনেতি পর্যন্ত। হিন্দুর যাবতীয় সাধন তন্ত্র-মন্ত্র শাক্ত-বৈষ্ণব দাস্য-মধুর—সমস্ত। মুসলমান খৃস্টান—কী নয়। হতভাগ্য কেন—না, সন্ন্যাসী হবার দরুন মায়ের মুখাগ্নি করতে পারবেন না, শ্রাদ্ধ করতে পারবেন না। গঙ্গায়

নামলেন মায়ের জন্যে তর্পণ করতে। গলিতহস্ত হয়ে গিয়েছেন, হাতে জল থাকল না, আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল। কিন্তু চোখের জল? চোখের জল ঝরতে লাগল নির্বিরাম।

কিন্তু স্বামীজি? স্বামীজি তো তার মাকে ছেড়ে চলে গেল আমেরিকায়, ধর্মপ্রচারে, বেদান্তব্যাখ্যায়, ঈশ্বরসন্ধানে। কিন্তু, না, সেখানে, সেই সুদূরেও তার মাতৃচিন্তা। দেশে থাকতে, যতদূর সম্ভব, মার খোঁজখবর নিয়েছে আর আমেরিকায় পাড়ি দেবার আগে তার শিষ্য খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংকে বলে গিয়েছে কলকাতায় তার মাকে মাস-মাস একশোটা করে টাকা পাঠাতে। আর অজিত সিং তা পাঠিয়েছিলেন মাস-মাস।

বেলুড়ে ফিরে এসে আবার লিখছে অজিত সিংকে, আমি আমার মাকে অবহেলা করেছি। এখন যখন আমার পরের ভাই মহেন্দ্রও বিদেশে চলে গিয়েছে মা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। আমার শেষ সাধ বাকি কটা বছর আমি মার সেবা করি। মার সঙ্গে একত্র বাস করতেই আমার ইচ্ছা আর ইচ্ছা ছোট ভাইটার বিয়ে দিই যাতে বংশধারা না নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ হলে আমার আর আমার মা'র শেষ কটা দিন শান্তিতে যায়। আমার মা এখন একটা ঝাপড়ির মত বাড়িতে বাস করেন। বড় সাধ মাকে একখানা ছোট সুন্দর বাড়ি করে দিই—'

অজিত সিং জিগগেস করে পাঠাল: একখানা বাড়ি করতে কত টাকা দরকার?

বিবেকানন্দ উত্তর দিল: 'দশ হাজার টাকা। আর একটা অনুরোধ, যদি সম্ভব হয় আপনি মাকে মাস-মাস যে একশো টাকা দিচ্ছিলেন সেটা স্থায়ী করে দিন। যাতে আমার মৃত্যুর পরেও, মা যদি তখনো বেঁচে থাকেন, তাঁর টাকাটা যেন বন্ধ না হয়। আর আমার প্রতি আপনার ভালোবাসা ও দয়া ফুরিয়ে গেলেও আমার মা'র ভরণপোষণটুকু যেন ঠিক বজায় থাকে।'

এইবার মিলে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। নিজের মায়ের জন্যে বিবেচনা, নিজের মায়ের জন্যে ব্যাকুলতা। নিজের মায়ের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ!

'ভারতীয় নারীর আদর্শ'—এর উপর আমেরিকায়, কেমব্রিজে বক্তৃতা দিল স্বামীজি। মেয়েদের অনুরোধে মেয়েদের সামনে বক্তৃতা। হিন্দু মেয়েদের চরিত্রের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব, তিতিক্ষা ও পবিত্রতার কথা জেনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সব হীন কথাই না এতদিন প্রচার করেছে। 'আর আমার যেটুকু উজ্জ্বলতা যেটুকু উন্নতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন,' বললে স্বামীজি, 'সব আমার মায়ের জন্যে।' বলে ভাষণের শেষে তার মা'র উদ্দেশে প্রণাম করল স্বামীজি।

গৃহত্যাগী সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী তবু মা'র প্রতি কী ভক্তি, কী কাতর্য—বিদেশিনীদের দল অভিভূত হল। স্বামীজিকে না জানিয়ে স্বামীজির মাকে একখানা মাতা মেরী ও একখানা যীশুর ছবি পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে দিল একখানি পত্র : 'তুমিই বিশ্বজননী মেরী আর বিবেকানন্দ তোমারই নিষ্কিঞ্চন শিশু, যীশু।'

দেশে ফিরে এলে মা ভুবনেশ্বরী মনে করিয়ে দিলেন, কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিতে হবে। কিসের পুজো? স্বামীজির বাল্যকালে কী এক 'মানত' করেছিলেন সেই পুজো। মা বলেছেন—আর কি স্বামীজি চুপ করে থাকতে পারে? কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে ভিজে কাপড়ে মায়ের মন্দিরে ঢুকল। মাতৃবলে বলীয়ান, বিলেতফেরৎ জেনেও কেউ স্বামীজিকে বাধা দিল না। মায়ের পাদপদ্মের সামনে তিনবার গড়াগড়ি দিল, সাতবার প্রদক্ষিণ করল মন্দির। নাটমন্দিরের পশ্চিমে মুক্ত অঙ্গনে নিজেই হোম করল।

নিজের মাকে আপ্রাণ ভালোবেসেছিল বলেই ভালোবাসতে পেরেছিল 'জ্যান্ত দুর্গাকে,' সারদামণিকে। 'আমি কোন নরাধম

তাঁর সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে কথা বলব ? তাঁকে আমার কোটি-কোটি প্রণাম দেবেন ও আশীর্ব্বাদ করতে বলবেন যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয় আর যেন শিগগির এর পতন হয়।' 'মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জন্মাবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই, মা-ঠাকুরানী গেলেই সর্বনাশ।'

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥

যা দিয়ে অক্ষরব্রহ্মকে জানা যায় তাই বিদ্যা। মহামায়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও নিয়মনকর্ত্রী, তাই মা পরমা। মুক্তি ও বন্ধ দুয়েরই কারণস্বরূপা। মা-ই সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী। তাই ঈশ্বরকে মা বলে ডাকো।

মাতৃ-উপাসনা এক স্বতন্ত্র দর্শন। এ একমাত্র হিন্দুর। জগৎ-ব্যাপারের পিছনে একটা শক্তি কাজ করছে সেই ধারণা থেকেই মাতৃভাব উদ্ভূত। মাতৃশক্তিই অপক্ষপাত মহাশক্তি। ঋগ্‌বেদের সেই মন্ত্রটি স্মরণ করো—অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাম্‌। অর্থাৎ মাতাই জগদীশ্বরী, সর্ববিধ ধনদায়িনী। তিনিই আবার ব্রহ্মজ্ঞান-বিরোধীকে ধ্বংস করবার জন্যে ধনু বিস্তৃত করেন। স্বর্গ-মর্তের পরেও মা বর্তমান।

'মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে।' বলছে বিবেকানন্দ, 'তাঁর জন্যেই তাঁকে ভালোবাসা, ভয়ে নয়, কিছু পাবার আশায় নয়। তাঁকে ভালোবাসো কারণ তুমি সন্তান। মন্দে-ভালোয় সর্বত্র তাঁকে সমভাবে দেখ। সব কিছু মায়ের খেলা—এই অনুভবেই মনে সমত্ব ও শান্তি আসে। সমত্ব আর শান্তিই মায়ের স্বরূপ। যতদিন এই অনুভব না হয় ততদিনই দুঃখ আমাদের পিছু নেবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করতে পারলেই আমরা নিরাপদ।'

ঠাকুরের কাছে একবার নালিশ করেছিল নরেন : 'তোমার বুড়ি খেলতে চায় তো একা খেলুক। আমাদের হায়রানি করা কেন ?'

ঠাকুর হেসে বলেছিলেন, 'তোকে নিয়েই তো তার খেলা।'

কাশ্মীরে শেষ দিকে নিবেদিতাকে স্বামীজি বললে, 'জানো আমি সব সময়ে আজকাল মাকে, কালীকে দেখি।'

'কোথায় ?' নিবেদিতা চমকে উঠল।

'সর্বত্র। এমনকি তোমাদেরও মধ্যে।'

স্বামীজি পুরোনো কথায় ফিরে গেল। আগে আগে কালীকে কী দারুণ ঘেন্না করতাম, তার হালচালও কেমন বেয়াড়া লাগত। ছ বছর লড়েছি মনের ওই অনীহার সঙ্গে, কিছুতেই মানব না কালীকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, হেরে গেলাম। মা'র কাছে হেরে যেতে, ধরা পড়াতেও শান্তি।

কি করে কী হল ? নিবেদিতা কৌতূহলী হল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে কালীর কাছে সঁপে দিলেন। ক্রমে আমার এই বিশ্বাস হল—আর এখন তো আমার পূর্ণ বিশ্বাস, কালীই আমাকে এতদিন চালিয়ে নিয়ে এসেছে আর তার খুশিমত কাজ করিয়ে নিচ্ছে। অথচ তার বিরুদ্ধে আমার কী মমতাহীন সংগ্রাম ছিল। আসল রহস্যটা কী জানো, আমি রামকৃষ্ণকে ভালোবাসতাম। সেই ভালোবাসাই আমাকে পরাস্ত করল। কী তোমার সাধ্য তাঁকে না ভালোবেসে পারো। তাঁর কী আশ্চর্য পবিত্রতা, কী নিশ্ছিদ্র স্নেহ! তাঁর মহত্ত্ব তখনো আমি পুরোপুরি বুঝিনি। আগে-আগে তো তাকে এক হাবাগোবা শিশু ভাবতাম, মাথার দোষে ভূতপ্রেত দেখছে। পরে বুঝলাম, পরে—যখন তিনি পরম আশ্বাসে আমাকে কালীর কাছে সঁপে দিলেন। তখন কালীকে স্বীকার করে নিতে হল।

সে এক গোপন রহস্য। সে কাহিনী আমার মৃত্যুর সঙ্গে-

সঙ্গেই বিলুপ্ত হবে। তখন আমার ঘোর বিপাক যাচ্ছে—আসলে সেই বিপাকই সৌভাগ্য—সোনার সুযোগ নিয়ে এল। কালী আমাকে তার ক্রীতদাস করে ফেলল। ঠিক বলছি, ক্রীতদাস। কম নয় বেশি নয়, একেবারে ক্রীতদাস।

ভবিষ্যৎ দেখো রামকৃষ্ণকে মা-কালী বলবে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কালীই তার কাজ করবার জন্যে শরীরী রামকৃষ্ণ হয়েছিল। বলো, মাকে, এমন মাকে না ভালোবেসে থাকা যায়?

ব্রহ্ম অখণ্ড, একমাত্র সত্তা। তাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু শক্তিরূপিণী মা, মৃত্যুরূপিণী কালী আমার কাছে স্পষ্টতর, নিকট-তর। আর তাকে ভালোবাসা সহজের চেয়েও সহজ, স্বভাবস্ফূর্ত।

'মৃত্যু বা কালীকে পূজা করতে সাহস পায় কজন?' আবার বলছে স্বামীজি, 'এস, ভয় কী, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জেনেই আলিঙ্গন করি, দুঃখকে দুঃখ জেনেই বুকে তুলে নিই। ভয় কী, ঐ ভীষণা ঐ কঠিনা যে আমাদেরই মা।'

একবার মা ভাবলে আর ভয় নেই ভ্রান্তি নেই বন্ধন নেই। মা-ই অভয়, মা-ই অমৃত, মা-ই আনন্দ। মা-ই রাজরাজেশ্বরী।

মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা। বুড়ির খেলা করতেই আনন্দ। আর চোখ না বাঁধলে তো লুকোচুরি জমে না। তাই সংসারলীলায় মোহের প্রয়োজন। মায়ের ইচ্ছায়ই তুমি মোহাচ্ছন্ন। মা-ই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। তিনিই আবার প্রসন্নবরদ-রূপে সন্নিহিত হয়ে তোমাকে জাগিয়ে দেবেন। যিনি বন্ধন তিনিই আবার মুক্তি। যিনি ভোগ তিনিই আবার অপবর্গ। যিনি মৃত্যু তিনিই আবার অনন্তজীবনজাগরণ।

সুতরাং ঈশ্বরকে মা বলে ডাকো। মা ডাকেই ভালোবাসা উথলে উঠবে। কিছু চাইবার থাকবে না। আর যা কিছু করবে,

মনে হবে সবই মা'র পূজা। প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥

ঈশ্বরকে মা বলি কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা। ঈশ্বরকে মা বলি যেহেতু বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। ঈশ্বরকে মা বলি যেহেতু মায়ের উপরে জোর খাটে। যেহেতু অনুরক্ত করে না পারি বিরক্ত করে আদায় করে নিতে পারি। যেহেতু মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা হলে মা মামলা ছেড়ে দেয়, হে'র যায়! 'মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে। আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে॥'

'আমি রাত্রে অন্ধকারে গঙ্গার পারে একা-একা বেড়াতুম, মা-মা বলে ডাকতুম,' বলছেন ঠাকুর, 'আর বলতুম, মা, আমার বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক। আমি আর কিছু চাই না, আমি শুধু তোকে চাই।'

'শিখেরা বললে, ঈশ্বর কি দয়ালু!' আবার বলছেন, 'হ্যাঁ রে, কোনো সন্তান কি বলে, আমার মা কী দয়ালু! বলে না। আমার মায়ের কৃপা স্বাভাবিকী। কেউ কি আগুনকে বলে, হে আগুন, আমাকে দাহ দাও, দীপ্তি দাও। বলে না। আগুনের দাহিকা আর দীধিতি স্বাভাবিকী। কেউ কি জলকে বলে, হে জল, আমাকে শীতল করো, নির্মল করো। জলের শৈত্যশক্তি ও নৈর্মল্যশক্তি স্বাভাবিকী। তেমনি গুণরহিত পুত্রে মা'র অধিকদয়া।'

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচত্বরে কেশব সেন বক্তৃতা দিচ্ছে। সে কী বাগবিভূতি! হৃদয়রাম গদ্গদ হয়ে বলছে, আহা, কী মল্লিকে ফুল বেরুচ্ছে!

ঠাকুরও ছিলেন সেই সমাবেশে। কতক্ষণ পরে উঠে চলে গেলেন নিজের ঘরে। সবাই ভাবলে গেঁয়ো মুখখু বামুন, সাধ্য নেই এই বাকপতি বিবুধেশ্বরের বক্তৃতা অনুধাবন করে। তাই সরে পড়েছে। কিন্তু কেশবের মনে ডাক দিল। তার মনে হল নিশ্চয়ই বলায়

কোনো ভুল হয়ে গেছে। তাই প্রসঙ্গ তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়াল। জিগগেস করলে, আমার কি কোনো ত্রুটি হয়েছে?

'নিশ্চয়ই হয়েছে।' ঠাকুর সরাসরি বললেন, 'তুমি শুধু ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করছিলে। তুমি কি তা বলে শেষ করতে পারবে? অনন্তকাল ধরে বললেও তার কণামাত্র পারবে না। কথাটা কী! ঈশ্বর এত প্রতাপবান এত ঐশ্বর্যশালী, তিনি আমাকে কত কী দিয়েছেন, আরো কত কী দিতে পারেন, তাই—তাই তাঁকে ভালোবাসব? ঈশ্বর যদি বেকার হতেন, বাউণ্ডুলে হতেন, যদি ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানি হতেন, তাহলে কি তাঁকে ভালোবাসতুম না? তাহলে বলতে চাও, বাবা যদি গরিব হয়, তাহলে ছেলে কি তাকে বাবা বলে ডাকবে না?'

পরদিন কলকাতা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল, দক্ষিণেশ্বরের গেঁয়ো মুখখু বামুন কেশবের মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে। 'বাবা গরিব হলে ছেলে কি তাকে বাবা বলবে না?'

বাবুর ছেলের সঙ্গে ঝি-এর ছেলের ঝগড়া হয়েছে। বাবুর ছেলের শক্তি-প্রতাপ বেশি, সে ঝি-এর ছেলেকে তু'ঘা মেরে দিয়েছে। ঝি-এর ছেলেও নিঃসম্বল নয়। সে তার কোমরে হাত রেখে বুক ফুলিয়ে বলছে, আমি আমার মাকে বলে দেব। তার মা যে পাঁচ টাকা মাইনের দাসী সে-খবর সে রাখে না, সে-খবরে তার প্রয়োজন নেই। তার মা আছে এই তার ঐশ্বর্য, এই তার অশেষ।

বালকের বিশ্বাস। বালকের ব্যাকুলতা।

'এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী। আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি॥'

'আমি বলব তবেই তুমি করবে এ-একটা কথাই নয়।' জগন্মাতাকে উদ্দেশ করে বলছেন রামকৃষ্ণ, 'আমার বুকের ভেতরটা

ব্যাকুল হবে তুমি তা জানতে পাবে না শুনতে পাবে না এ একটা কথাই নয়। তবে বলি কেন? ডাকি কেন? তুমি যেমন বলাও তেমনি বলি যেমন ডাকাও তেমনি ডাকি। ওরে মা যে আবার তার ছেলের কণ্ঠে মা-ডাক শুনতে চায়। ছেলে মাকে ডাকে না, মায়ের খোঁজ করে না, মা-ভোলা হয়ে থাকে, এ মায়ের ভালো লাগে না। তাই তো বারে বারে মাকে ডাকি, মা'র কাছে ছুটে-ছুটে আসি। মাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাই।'

শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের কণ্ঠেও এই মা ডাক। এই মায়ে বিশ্বাস। মায়ের জন্যে ব্যাকুলতা।

বিবেকানন্দ শেষ পর্যন্ত মা-মা ডাকতে লাগল। তার ব্রহ্ম কালী হয়ে গেল। অদ্বৈতজ্ঞান থেকে সে চলে এল ভক্তিতে।

'ভক্তিমার্গ স্বাভাবিক পথ এবং তাতে মেতেও বেশ আরাম।' বলছে বিবেকানন্দ, 'জ্ঞানমার্গ কী রকম? যেন একটা প্রবল-বলশালিনী পার্বত্য নদীকে জোর করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে তাড়াতাড়ি বস্তুলাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন, বড় কষ্টসাধ্য। জ্ঞানমার্গ বলে, সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ করো। ভক্তিমার্গ বলে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, চিরদিনের জন্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করো। ভক্তির পথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর।'

ভক্ত কী বলে? বলে, প্রভু, চিরকালের জন্যে আমি তোমার। এখন থেকে আমি যা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিক তুমিই করছ—'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই।

আমার অর্থ নেই যে আমি দান করব। বুদ্ধি নেই যে শাস্ত্র শিক্ষা করব। সময় নেই যে যোগাভ্যাস করব। হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে দেহমন সমর্পণ করলাম।

ঈশ্বর বলে যদি কেউ নাও থাকে তবু প্রেমের ভাবকে দৃঢ় করে থাকো। কুকুরের মত পচা মড়া খুঁজে-খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরকে

অন্বেষণ করতে করতে মরা মহত্তর। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বেছে নাও আর সেই আদর্শকে লাভ করবার জন্যে সারাজীবন নিয়োজিত করো। মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন একটা মহান উদ্দেশ্যের জন্যে জীবনপাত করার চেয়ে বড় আর কিছু হতে নেই।

জ্ঞানী বড় সূক্ষ্ম বিচার করতে ভালোবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়। কিন্তু ভক্ত বলে, ঈশ্বর তাঁর যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন। তাই সে সব কিছুই গ্রহণ করে।

কাশ্মীরে নৌকো করে ধীরামাতা জয়া ও নিবেদিতার সঙ্গে বেড়াচ্ছে বিবেকানন্দ। গান ধরেছে :

'ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা,
আমি তবু কালী বলে ডাকি মা, সাবাস আমার বুকের পাটা ॥'

আবার ধরল :

'মন কেন ভাবিস এত
যেন মাতৃহীন বালকের মত
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত,
কালেরও কাল যে মহাকাল সে কাল মায়ের পদানত ॥'

শেষে, শিশু মায়ের উপর রাগ করলে যেমন অভিমানে কথা বলে তেমনি সুরে গান ধরল স্বামীজি :

'শ্রীরামপ্রসাদ বলে নিদানকালে
কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে
বিমাতাকে মা বলিব ॥'

যা রামকৃষ্ণ তাই বিবেকানন্দ। শেষে দুজনেই 'শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি।' দুজনেরই কণ্ঠে প্রেম-গদগদ মা-ডাক। 'এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণা-প্রেমে না গলে। ওরে এ রসনায় ধিক ধিক কালীনাম নাহি বলে।'

ভোরবেলা মঠের নিচের তলায় বড় বেঞ্চির উপর বসে আছে স্বামীজি, গঙ্গার দিকে মুখ করে। শরৎ চক্রবর্তী এসে তাকে পূজা করতে বসল।

ভক্তের অর্চনাকে স্বামীজি বাধা দিল না।

পূজা হয়ে গেলে স্বামীজি বললে, 'তোর পুজো তো হল কিন্তু বাবুরাম এসে তোকে এখুনি খেয়ে ফেলবে।'

'কেন, কী করেছি ?' শরৎ চমকে উঠল।

'তুই ঠাকুরের বাসনে, তাঁর পুষ্পপাত্রে আমার পা রেখে পুজো করলি।' বলতে না বলতেই স্বামীজি দেখল বাবুরাম দাঁড়িয়ে।

'ওরে ছাখ, শরৎ আজ কী কাণ্ড করেছে!' বাবুরামের উদ্দেশে স্বামীজি মুখর হয়ে উঠল: 'ঠাকুরের পুজোর থালা বাসন চন্দন এনে ও আজ আমার পুজো করেছে।'

বাবুরাম হাসতে লাগল। বললে, 'ঠিকই করেছে। তুমি আর ঠাকুর কি আলাদা ?'

কতক্ষণ পরেই বিবেকানন্দ বলে উঠল: মা, মা, কালী কালী।

'কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা।
গেল গেল কাল, বিফলে গেল, দেখ না কালান্ত নিকটে এল,
প্রসাদ বলে, ভালো, কালী কালী বল, দূর হবে কাল-যম-যন্ত্রণা॥'

নিবেদিতা বলছে, সবসময়েই মাতৃচিন্তায় তন্ময় স্বামীজি। আমি যেহেতু মা'র দুরন্ত ছেলে, দুর্দান্ত ছেলে, আমার প্রতিও মা'র দুর্জয় টান। এই স্বামীজির তর্পণ। জানবে আমার যত মন্দ আর দুর্ভাগ্য তাও মা'র হাতের উপহার। মা'র ডান হাতে অভয় বাঁ হাতে অভিশাপ। আহা, তাঁর অভিশাপও আশীর্বাদ। তাঁর প্রহারও প্রলেপ। চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা। তাঁর নিষ্ঠুরতাই তো শুভকরী। তাঁর নিষ্ঠুরতা না হলে যে আমাদের জীবত্বের ঘুম ভাঙে না। খড়্গোই তো মা পরাসুন্দরী।

'আমি সেই পরাসুন্দরীকে পূজা করি। সেই ভয়ঙ্করীকে।' বলছে স্বামীজি, 'খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা। শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডী পরিঘায়ুধা॥ সেই ভয়ঙ্করীই তো মনোহারিণী। নিত্যাক্ষরা সুধা। আমার মা মৃত্যুরূপা, আর মৃত্যুই তো মাতৃ-আলিঙ্গন।' পরে গম্ভীর স্বর স্নিগ্ধ হল স্বামীজির : 'সব মানুষই সৌভাগ্য-সম্ভোগ চায় এ ঠিক নয়। অনেক লোকের জন্ম হয় শুধু দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে। ভয়ঙ্করের মুখোমুখি হবার জন্যে। ভয়ঙ্করকে আমার ভয়ঙ্কররূপেই পুজো করব, মৃত্যুকেই মৃত্যুরূপে, মাতৃরূপে।'

'কিন্তু পশুবলি সম্বন্ধে কী বলবেন?' জিগগেস করল নিবেদিতা।

তর্ক নয়, তপ্ত-তিক্ত বক্তৃতা নয়, স্বামীজি নীরবে একটু হাসল। পরে বললে, 'চিত্রটাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে একটু-আধটু রক্ত হলে মন্দ কী।'

পরে আরো বিশদ হল স্বামীজি : মা আমার সমস্তে। হিংসায় দ্বেষে পাপে লজ্জায় ধ্বংসে শোকে বেদনায় বন্ধনে। শুধু সু-তে নয় কু-তেও মা। মা-ই সর্বব্যাপিনী। সেই বিরাট ভাবটাকে কিছুতেই কোমল করা নয়, তরল করা নয়। আমার মা ভূমিকম্পে, তুষারঝড়ে, আগ্নেয়গিরির নিদারুণ বিদারণে। মা আমার প্রলয়-বিলয়রূপিণী। প্রলয়ের মধ্যেও কি অনির্বচনীয় বাস করে না? কেন মা করুণাবরুণালয়া হবে? না, মা আমার সংহারিণী বলেই আমি তাকে পূজা করব, ভালোবাসব। কিছুতেই ভয় করব না। মা যখন, তখন আর ভয় কোথায়? পাপ কোথায়? মন্দ কোথায়?

'ওরা মূর্খ, মা'র গলায় মুণ্ডমালা দোলায়, তার পরে ভয় পায়।' বললে স্বামীজি, 'ভয়ে তখন মাকে করুণাময়ী বলে। মা করুণাময়ী হতে যাবেন কেন? থাকুন মা নিধন-পীড়নের মূর্তি ধরে। তবু

তাকে আমি ভালোবাসব। আমার ভালোবাসায় দোকানদারি নেই। কিছু লোভের মাল লাভ করবার আশায় তাকে করুণাময়ী বলে স্তুতি করব না। ভালোবাসার জন্যে ভালোবাসব।'

আনন্দই মায়ের স্বরূপ। মা-ই নিত্য মধুমতী। মাকে দেখ সর্বত্রই মধু দেখবে। আমার রোগে শোকে দুঃখে ক্লেশে সর্বত্রই মা'র মধুপান। যেখানে মা'র আনন্দ সেখানে আমার সঙ্কোচ নেই, কার্পণ্য নেই, ভয়লেশ নেই। মা'র কোলে বসে মা'র খেলা দেখ। সবচেয়ে সুলভ বস্তু মা, মায়ের কোল। সবচেয়ে সহজ বৃত্তি মাকে ভালোবাসা। সেই পরানুরক্তিই ভক্তি।

যদি একবার মায়ের কোলে চড়ে বসা যায় তাহলে আর প্রশ্ন থাকে না, এ আমি কোথায় আছি? সুখে আছি না দুঃখে আছি? কণ্টকে আছি না কুসুমে আছি, কর্দমে আছি না কুঙ্কুমে আছি? আমি মায়ের কোলে আছি। মায়ের কোলের বাইরে অকূল বলে কিছু নেই।

কত বড় জোর, কত বড় নির্বন্ধন, মায়ের কাছে কিছু চাইতে হয় না। আমি খেটে যাই ডেকে যাই কেঁদে যাই, যা করবার মা করবেন। যদি কিছু নাও করেন তাতেও আমি সম্মত। যদি কোলে তুলে নেন তবুও মা, যদি ধুলোয় ফেলে রাখেন তবুও মা। আমি জানি সর্বসঙ্গই মা'র উৎসঙ্গ।

আরো কত সুবিধে, ভোগ বা নৈবেদ্য কিছু দিতে হয় না মাকে। ভোগ বা নৈবেদ্য বলে যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে অন্তরমধু, প্রীতি-ভক্তি। স্বামীজি বলছে, 'আমাকে প্রেম দাও, শুধু প্রেম—যে প্রেম অন্য কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশা করে না, প্রেম ছাড়া আর কিছু আকাঙ্ক্ষাও করে না।'

গ্রাম্য বাউলের গান শোনো :

'শোন রে মানুষ ভাই
প্রেমের কথা কয়ে যাই।

আমি জ্ঞানের ডাকে ভয় করিনে
প্রেমের ডাকে করি ভয়,
আমার আসন কাঁপে প্রেমের ডাকে
প্রেমাশ্রুতে হই উদয়॥'

শুধু ভালোবাসার জন্যে ভালোবাসা। লণ্ডনে এক বক্তৃতায় স্বামীজি যুধিষ্ঠিরের কাহিনী শোনাল। যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাচ্ছে, দেখল উত্তুঙ্গ পর্বত, তার শৃঙ্গে রজতধবল তুষারের সমাবেশ। কী গম্ভীর লাবণ্যবিস্তার! তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল যুধিষ্ঠির। রাজ্য-বৈভব ত্যাগ করে এসেছে, কোনো পার্থিব পদার্থে স্পৃহা নেই, চোখের সামনে প্রত্যক্ষগোচর তুষারশোভাই তার একমাত্র বন্দনীয়। গিরিশৃঙ্গকে সম্বোধন করে বলছে, গিরিবর, তোমার কাছে আমি কোনো কিছু প্রার্থনা করি না, আকাঙ্ক্ষা করি না, আমার সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু তোমার অপূর্ব গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, প্রীত হয়েছি। তোমাকে ভালোবাসার জন্যেই তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে দেখার জন্যেই তোমাকে দেখি। কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করে নয়, বিচার করে নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে নয়। স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার প্রাণ তোমার সৌন্দর্যের সঙ্গে নিঃশেষে মিশে যেতে চাইছে। ফলাকাঙ্ক্ষা অতি তুচ্ছ জিনিস, ভালোবাসার জন্যেই ভালোবাসা—এই প্রথম ও এই শেষ কথা।

গভীর অনুভূতিতে স্পন্দিত হল শ্রোতৃদল।

স্বর্গের দরজা পর্যন্ত এসেছে, যুধিষ্ঠিরকে দ্বারপাল বাধা দিল। বললে, 'আপনি পুণ্যাত্মা, আপনি স্বর্গে প্রবেশ করুন, কিন্তু আপনার সঙ্গে-সঙ্গে একটা কুকুর চলে এসেছে, সে ঢুকতে পাবে না।'

'কেন?' যুধিষ্ঠির থমকে দাঁড়াল।

'কুকুর অস্পৃশ্য, তার স্বর্গপ্রবেশে অধিকার নেই।' বললে দ্বাররক্ষী, 'আপনি কুকুরকে ত্যাগ করে একলা ভিতরে চলে যান।'

'সে কী? কুকুর আমার আশ্রিত, কখন থেকে সে আমার সঙ্গ

নিয়েছে, কত কষ্টে দীর্ঘ পার্বত্য পথ উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, আমি কিছুতেই আমার আশ্রিত ভক্তকে ত্যাগ করতে পারি না।' বললে যুধিষ্ঠির, 'যদি ইচ্ছে হয় আমাদের দুজনকেই প্রবেশ করবার অনুমতি দিন, নচেৎ বলুন আমরা দুজনেই মর্তধামে ফিরে যাই। কুকুরকে, আমার আশ্রিতকে ছেড়ে, আমি একলা স্বর্গে যাব এ কিছুতেই হতে পারে না।'

দ্বারপাল খুলল না দরজা।

অগত্যা যুধিষ্ঠির কুকুরসহ ফিরে চলল। আমার ভক্তকে আশ্রিতকে কখনই আমি সঙ্গবিচ্যুত করি না।

তখন কুকুর তার স্বরূপ ধরল। যুধিষ্ঠির দেখল স্বয়ং ধর্মরাজ দাঁড়িয়ে।

ধর্মরাজ বললে, 'আমি এতক্ষণ ছদ্মবেশে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। কুকুরকে কে আশ্রয় দেয়? কেউ দেয় না। শুধু তুমি দিলে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া রাজধর্ম, তুমি সেই রাজধর্ম পালন করলে। পথে তোমার স্ত্রী ও চার ভাই মরে পড়ে আছে, তবু তুমি, ঈশ্বরলাভে দৃঢ়সংকল্প, বিন্দুমাত্র বিচলিত হলে না। কিন্তু অস্পৃশ্য কুকুরকে ত্যাগ করলেই তবে ঈশ্বরলাভে সমর্থ হবে এ শুনতেই তুমি বিচলিত হয়ে পড়লে। ঈশ্বরলাভ না আশ্রিত-ত্যাগ কোনটা শ্রেয় এ নিদারুণ প্রশ্ন তোমার সামনে এসে দাঁড়াল। তুমি পলকে স্থির করলে স্বর্গলাভ ঈশ্বরলাভ তুচ্ছ, আশ্রিত রক্ষা করাই বরণীয়। এইজন্যে তুমি মর্তে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলে। দেখালে তুমি সব ত্যাগ করতে পারো, এমনকি স্বর্গসুখ পর্যন্ত, কিন্তু আশ্রিতকে ত্যাগ করতে পারো না। নিঃস্বার্থ ধর্ম কী তুমিই তার প্রমাণ। চলো, স্বর্গে যাবার তোমারই সর্বোচ্চ অধিকার।

মহিলারা বক্তৃতা শুনে খুব খুশি। তাদের অনেকেই কুকুর পোষে, কুকুরের জন্যে যে স্বর্গে যাওয়াও বাতিল করা যায় তাতে তাদের পূর্ণ সমর্থন।

তারপর স্বামীজি একদিন সেই তেঁতুলগাছের পাতা গোনার গল্প বললে।

গাছতলায় বসে একটা লোক গাঁজা টানছিল, নারদকে সে-পথে বৈকুণ্ঠে যেতে দেখে লোকটা বললে, নারায়ণকে জিগগেস করে এস তো কত জন্ম পরে আমার নারায়ণ দর্শন হবে ?

নারদ ফিরে এল বৈকুণ্ঠ থেকে। লোকটা জিগগেস করলে, 'কি, কত জন্ম পরে ?'

'নারায়ণ বললেন, তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে তত জন্ম পরে।' নারদ বললে হতাশ মুখে।

লোকটা নৃত্য করতে শুরু করল।

'ও কি, তোমার এত ফুর্তি হল কিসে ?' নারদ তাকাল গাছের দিকে : 'গাছে কত পাতা আছে খেয়াল করতে পারো ? মনে রেখো তত জন্ম পরে।'

'হোক লক্ষ কোটি পাতা, লক্ষ কোটি জন্ম ! তবু তো একদিন আমার নারায়ণ দর্শন হবে।' লোকটা উন্মাদের মত লাফাতে লাগল : 'আমারও হবে। আমি যে আমি আমিও নারায়ণ দর্শন করব। আমাকে তবে পায় কে, দেখে কে।'

নারদ স্তম্ভিত হয়ে গেল। নারায়ণের কাছে গিয়ে দিল সব বিবরণ।

ওর এত দৃঢ় ভক্তি! এত সুগভীর বিশ্বাস। তবে আর দেরি নয়। ওর এ জন্মেই মুক্তি হবে। এ জন্মেই ও দেখতে পাবে আমাকে।

বক্তৃতা শুনে সকলে আশায় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সকলেই বিশ্বাস করল একদিন না একদিন দেখতে পাবে সেই পরমপ্রিয়কে।

'এমন সুন্দর কথা আর কখনো শুনিনি।' শ্রোতার দল স্বামীজিকে বেষ্টন করে ধরল : 'তোমার রাজযোগের ধ্যান-ধারণার

কথা, দর্শন বা ন্যায়শাস্ত্রের কথা বড় কঠিন মনে হয় কিন্তু এ ভক্তি-বিশ্বাসের কথা কী চমৎকার সোজা !'

যেন একেবারে মা'র মত।

বাবা হচ্ছে জ্ঞান, মা হচ্ছে ভক্তি। বাবা কখনো ধুলো-কাদা-মাখা সন্তানকে কোলে নেন না, কিন্তু মা নেন। ভক্তি-পথে ধুলো-কাদা মেখেও মা'র কোলে ওঠা যায়।

যেমন গিরিশ ঘোষ উঠেছে।

'গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শোনবার দরকার হয় না। তবে এরকম ভক্তি-বিশ্বাস জগতে দুর্লভ।' বলছে স্বামীজি, 'গিরিশবাবুর মত যাদের ভক্তি-বিশ্বাস তাদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই, কিন্তু গিরিশবাবুকে অনুকরণ করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে।'

সেই গিরিশকে ভৈরব সাজাল স্বামীজি। যে ভক্তের ভক্ত সেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

বেলুড়ে ভাড়াটে বাড়িতে মঠ উঠে এসেছে আলমবাজার থেকে। ঠাকুরের তিথিপূজা হচ্ছে। মঠের সন্ন্যাসীরা স্বামীজিকে যোগীবেশে সাজিয়ে দিল। কানে শঙ্খের কুণ্ডল, গায়ে কর্পূরগৌর বিভূতি, মাথায় জটা, বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলায় ত্রিবলীকৃত রুদ্রাক্ষমালা। বামহাতে ত্রিশূল—একেবারে সর্রবিশ্বৈকজেতা মহাদেব।

কতক্ষণ পরে সেখানে গিরিশ এসে উপস্থিত হল।

'এস জি-সি, তোমাকে সাজিয়ে দিই।'

স্বামীজি নিজের বেশভূষা খুলে ফেলল। সাদরে নিজের হাতে সাজাতে বসল গিরিশকে। যেমনটি নিজে সেজেছিল ঠিক তেমনি। অবাধে অঙ্গ ঢেলে দিল গিরিশ। বিশাল দেহে ছাই মাখানো, মাথায় জটাপুঞ্জ, কানে কুণ্ডল, বাহুতে গলায় রুদ্রাক্ষ, হাতে ত্রিশূল—সে এক জগদ্দীপাকার শিব মূর্তি।

এততেও হল না। গেরুয়া পরিয়ে দিল।

'এই ঠিক-ঠিক ভৈরব সেজেছে জি-সি।' স্বামীজি বললে, 'আমাদের সঙ্গে ওর কোনো প্রভেদ নেই।'

কালিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে।

আসল কথা কী জানো? বিশ্বাস। আর বিশ্বাস হলেই ব্যাকুলতা।

'কেবল বিশ্বাসী হও! বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।' বলছে স্বামীজি, 'আর অগ্নিময় বিশ্বাস এলেই জাগবে অগ্নিময় ব্যাকুলতা।'

যীশুখৃষ্টের এই কথাগুলি মনে করো: 'চাইলেই তোমাকে দেওয়া হবে, অনুসন্ধান করলেই তুমি পাবে, করাঘাত করলেই খুলে যাবে দরজা।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভগবানকে চায় কে? যদি সত্যি-সত্যি কেউ চায়, জলেডোবা লোক যেমন মুক্ত বাতাসকে চায়, তাহলে সে চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। যদি ছেলে মাকে সত্যিই চায়, যদি চাপা-দেওয়া গায়ের বালিশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সত্যিই কেঁদে উঠতে পারে, সে পেয়ে যায় মা'র কোল।

'ধরো, এ ঘরে একটা চোর আছে।' বলছে স্বামীজি, 'সে কোনোরূপে জানতে পেরেছে পাশের ঘরে একতাল সোনা আছে, আর দুঘরের মাঝে যে দেয়ালটা আছে সেটা খুব পাতলা। এ পরিস্থিতিতে চোরের কী অবস্থা হবে। তার ঘুম হবে না, সে আর কিছুই করতে পারবে না, কী করে ঐ সোনার তাল সংগ্রহ করবে সেই দিকে তার মন পড়ে থাকবে। মানুষ যদি সত্যিই বিশ্বাস করত তার পরম আনন্দ আর গৌরবের খনি স্বয়ং ভগবান এখানে রয়েছেন, তাহলে কি তা উপেক্ষা করে সাধারণ সাংসারিক তুচ্ছতায় লিপ্ত হতে পারত? কখনো না। সে ভগবানকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ হয়ে ফিরত। ভেঙে ফেলত তার এ-ঘর ও-ঘরের ব্যবধান।

বিশ্বাস করো পাশের ঘরেই তোমার সর্বাশ্রয়া মা আছেন।

আর তুমি যদি তার শিশু হও দেখি কেমন তার জন্যে তুমি ব্যাকুল না হয়ে পারো।

মা-ই শ্রেষ্ঠা পূজনীয়া। মায়ের প্রসন্নতা ও ক্রোধ দুইই আমাদের মঙ্গলদায়ক। মায়ের ভ্রূকুটিকরাল কুপিত মুখশ্রী দেখে আমাদের ভয় নেই। মা'র প্রসন্নতায় যেমন, কোপেও তেমনি মাতৃস্নেহ। মা-ই প্রসাদসুমুখী। মা-ই সর্বত্র অভ্যুদয়দায়িনী।

মায়াবতীর জনৈক ব্রহ্মচারীকে স্বামীজি চিঠি লিখছে: 'তোমার মাকে পত্র লেখ না কেন? ও কি কথা? মাতৃভক্তি সকল কল্যাণের কল্যাণ।'

মাদ্রাজে একাউন্টেন্ট-জেনারেল মন্মথ ভটচাজের বাড়িতে আছে, স্বামীজি একদিন স্বপ্ন দেখল, মা মারা গেছেন। আমেরিকায় যাওয়া ঠিকঠাক, এমন সময় এই দুঃস্বপ্ন! মায়ের শারীরিক কুশল জানতে না পেরে কী করেই বা রওনা হওয়া যায়! ব্যাকুল হয়ে মন্মথ-বাবুকে বললে, কলকাতায় টেলিগ্রাম করে দিতে। কিন্তু টেলিগ্রামের উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করারও ধৈর্য নেই। মায়ের জন্যে এত অস্থির হয়েছে স্বামীজি।

মন্মথবাবু বললে, চলো তোমাকে এক সাধুর কাছে নিয়ে যাই, সে শুভাশুভ ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে।

চলুন। এক মুহূর্ত তর সইছে না স্বামীজির।

খানিকটা ট্রেন খানিকটা পায়ে-হাঁটা, মন্মথবাবু স্বামীজিকে একটা শ্মশানে নিয়ে এল। সেখানে বিকটাকার মিশ-কালো একটা ঢ্যাঙা লোক বসে আছে। দিশি ভাষায় তার অনুচররা জানাল এ শুধু সাধু নয় এ এক পিশাচসিদ্ধ মহাপুরুষ।

আলাসিঙ্গা সঙ্গে ছিল, দোভাষীর কাজ করে বোঝাল সাধুকে। এ সন্ন্যাসী তার মায়ের জন্যে ব্যাকুল। হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হয়েও সে মাকে ছাড়েনি, মাকে ভোলেনি। যদি বলে দেন কেমন আছেন ওর মা।

সাধু কাগজে পেন্সিল দিয়ে কতগুলো হিজিবিজি আঁক পাড়তে লাগল। পরে মন একাগ্র করে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল।

তারপর মুখ খুলল। স্বামীজির নাম বললে, গোত্র বললে, চৌদ্দপুরুষের খবর বললে। আরো বললে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন।

'কিন্তু মা, আমার মা?'

ভালো আছেন। বাড়ি ফিরেই টেলিগ্রাম পাবে।

বাড়ি ফিরেই টেলিগ্রাম পেল। মা ভালো আছেন। তবে স্বামীজি নিশ্চিন্ত হল।

'বর্তমান যুগে ভগবানকে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননীরূপে উপাসনা করা দরকার।' বলছে স্বামীজি, 'এতে পবিত্রতার উদয় হবে। আর এই মাতৃপূজায় মহাশক্তির উদ্বোধন হবে।'

মা আছেন একবার এই বিশ্বাস যদি জীবনে দৃঢ়মূল হয় তাহলে আর কিছু আকাঙ্ক্ষনীয় থাকে না। তখন কোথায়ই বা চাঞ্চল্য কোথায়ই বা আসক্তি।

'কিছু পাবার চেষ্টা কোরো না।' বলছে স্বামীজি, 'কিছু এড়াবার চেষ্টাও কোরো না। যা কিছু আসে গ্রহণ করো, যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট হও। কোনো কিছুতে বিচলিত না হওয়াই মুক্তি বা স্বাধীনতা। কেবল সহ্য করে গেলে হবে না, একেবারে অনাসক্ত হও।'

সেই ষাঁড়ের গল্পটা মনে করো।

একটা মশা অনেকক্ষণ ধরে একটা ষাঁড়ের শিঙে বসেছিল। অনেকক্ষণ বসবার পর তার বিবেকবুদ্ধি জাগল, হয়তো ষাঁড়ের শিঙে বসে থাকার দরুন তার বড় কষ্ট হচ্ছে। সে তাই ষাঁড়কে বললে, 'ভাই ষাঁড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার শিঙের উপর বসে আছি, বোধহয় তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমায় মাপ করো, আমি এই উড়ে যাচ্ছি।' ষাঁড় বললে, 'না, না, তোমার ব্যস্ত হতে

হবে না, তুমি সপরিবারে এসে আমার শিঙে বসবাস করো না—তাতে আমার কী এসে যায়!'

ঈশ্বরকে ভয় করা থেকে ধর্মের সূত্রপাত কিন্তু এর পর্যবসান প্রেমে। একমাত্র ভালোবাসাই ভয় মানে না। একমাত্র মা-ই তার শিশুকে বাঁচাবার জন্যে বাঘের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। প্রেম নিজেই নিজের লক্ষ্য। সে কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নয়, সে নিজেই পূর্ণতম সিদ্ধি। প্রেমের সীমা কোথায়। কী তার আদর্শ? ঈশ্বরে পরম অনুরাগ এই তার চরম সীমা। ঈশ্বরকে মানুষ কেন ভালবাসবে? এই 'কেন'-র কোনো উত্তর নেই যেহেতু ভালোবাসা কোনো অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে নয়। যদি ভালোবাসা আসে তাহলেই সমস্ত এসে গেল। ভালোবাসাই মুক্তি, ভালোবাসাই স্বর্গ, ভালোবাসাই পূর্ণতা। আর কী চাই? অন্য আর কী প্রাপ্তব্য থাকতে পারে? প্রেমের চেয়ে মহত্তর আর কী তুমি পেতে পারো?

নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদকে বর দিতে চেয়েছিল, কী বলেছিল প্রহ্লাদ? বলেছিল, আমি কি বণিক, আমি কি ব্যবসা করতে বসেছি? বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কোনো সুখের দ্রব্য পাব তাই তোমাকে ভালোবেসেছি, সহ্য করেছি অন্তহীন প্রহার-পীড়ন? না, কিছু চাই না, তবু তোমাকে ভালোবাসি। যদি একান্তই বর দিতে চাও তো এই বর দাও যেন আমার হৃদয়ে কোনো কামনার উদ্রেক না হয়।

একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্। গোবিন্দে একান্ত ভক্তি ও সর্বত্র তাঁকে দেখা—এই মানুষের পরম স্বার্থ।

'আমি বিশ্বাস করি,' বলছে স্বামীজি, 'যদি কোনো পুরুষ ও নারী পরস্পরকে যথার্থ ভালোবাসতে পারে, তবে যোগীরা যে সমস্ত বিভূতি লাভ করেছেন বলে দাবি করেন, তবে সেই পুরুষ ও নারীও সেই সকল শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হবে—যেহেতু প্রেম যে স্বয়ং

ঈশ্বর। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবান সর্বত্র বিরাজমান এবং সেজন্যে তোমাদের মধ্যেও এই ভালোবাসা আছে, তোমরা জানো বা না জানো।'

আবার বলছে, 'একদিন সন্ধ্যার সময় আমি একটি যুবককে একটি তরুণীর জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছিলাম। ঠিক করলাম, যুবককে পরীক্ষা করবার এই উপযুক্ত অবসর। দেখলাম সে তার প্রেমের গভীরতার মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও দূরশ্রবণের ক্ষমতা লাভ করেছে। ষাট কি সত্তর বারের মধ্যে যুবক একটিবারও ভুল করেনি—কিন্তু তরুণী ছিল দুশো মাইল দূরে। বলছে, 'এইভাবে ও সেজেছে,' 'এই ও চলতে শুরু করেছে,' 'এই ও দাঁড়িয়ে পড়েছে'—এমনি সমস্ত দৃশ্য তার যোগদৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। বিশ্বাস করো, আমি এ নিজের চোখে দেখেছি।'

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা-মগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥ কোন মানুষটা বিচারশীল? সকলেই পাগল। শিশুরা পাগল খেলায়, তরুণ পাগল তরুণীকে নিয়ে, বৃদ্ধ পাগল অতীতের চর্বিতচর্বণে। কেউ পাগল টাকার জন্যে। কেউ বা নামযশ পদবীর জন্যে। তেমনি কেউ ঈশ্বরের জন্যেই বা পাগল হবে না কেন?

স্বামীজি বলছে, 'জন জেনের জন্য যেমন পাগল হয়ে ছুটছে তেমনি ঈশ্বরের প্রেমের জন্যে তুমি উন্মাদ হও। কোথায় এমন লোক কোথায়? বলে, আমি কি এটা ছাড়ব? অমুকটা কি এড়িয়ে যাব? একজন জিগগেস করেছিল, বিয়ে কি করব না? না, কোনো বিষয়ই ছাড়তে যেও না, বিষয়ই তোমাকে ছেড়ে যাবে। অপেক্ষা করো, তোমাকেই সব ভুলিয়ে ছাড়বে। রোম্যান ক্যাথলিকদের মধ্যে সে সব আশ্চর্য সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী কি দেখনি—যারা অলৌকিক ভগবৎপ্রেমে একেবারে আত্মহারা! এমনি ভগবৎপ্রেমে পরিণত হওয়াই প্রকৃত উপাসনা। এই

প্রেমই লাভ করতে হবে যে প্রেম কিছু চায় না, কিছু অন্বেষণ করে না।'

গোপীপ্রেমের কথা ভাবো। নারদের মতে ভক্তির চিহ্ন কী কী? যখন সকল চিন্তা সকল বাক্য সকল কর্ম ভগবানে সমর্পিত হয়, ভগবানকে স্বল্পক্ষণ বিস্মৃত হলেও যখন অতি গভীর দুঃখের উদয় হয়, যখন দেহরক্ষার জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত সমস্ত লৌকিক আচরণই দূরে যায়। নারদ বলছে, এই প্রেম গোপীদের ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করলেও তাঁর ভগবৎস্বরূপ তারা কখনো বিস্মৃত হয়নি। এই ভক্তির সর্বোচ্চ রূপ। মানুষের সব ভালোবাসার প্রতিদানে কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, গোপীপ্রেমে এই আকাঙ্ক্ষার বাষ্পমাত্র নেই।

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজন্ ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন॥ শ্রীনিবাস ভগবান প্রসন্ন হলে কী অলভ্য থাকতে পারে? তবু যে ভগবৎপরায়ণ সে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না।

'ভগবানের সঙ্গে একায়ন, মানুষের এইই চরম লক্ষ্য।' বলছে স্বামীজি, 'মানুষের সব ভালোবাসা সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকেই যায় যেহেতু তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ।' 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা, প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।'

'এই হৃদয় আর কাকে ভালোবাসবে? ঈশ্বরের চেয়ে সুন্দর আর কে আছে?' বলছে স্বামীজি, 'তিনি ছাড়া আর কে স্বামী হবার উপযুক্ত? আর কাকে আমার ভালোবাসার পাত্র করতে পারি? সুতরাং তিনিই আমার স্বামী হোন, আমার পরমতম প্রেমাস্পদ হোন। মূর্খেরা কী করে বুঝবে এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা? হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন আমাকে দাও। যাকে তুমি একবার চুম্বন করেছ, তোমার জন্যে

তার পিপাসা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তার সমস্ত দুঃখশোক চলে গিয়েছে। তোমাকে ছাড়া আর সব সে বিস্মৃত হয়েছে। প্রিয়তমের সেই অধরস্পর্শের জন্যে ব্যাকুল হও—এই অমরস্পর্শই ভক্তকে পাগল করে দেয়, মানুষকে দেবতা করে তোলে। ভগবান যাকে একবার তাঁর অধরামৃত দিয়ে কৃতার্থ করেছেন তার সমস্ত প্রকৃতিই বদলে যায়। তার কাছ থেকে জগৎ চলে যায়, সূর্য-চন্দ্র চলে যায়, সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ সেই এক অনন্ত প্রেমসমুদ্রে বিগলিত হয়।'

'অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥'

মিলনে বাধা থাকলেই উৎকণ্ঠা বেশি। আর যত বেশি উৎকণ্ঠা তত বেশি আনন্দ-চমৎকারিতা। স্বকীয়া কান্তা অনায়াসলভ্যা, তার সঙ্গে মিলনে কোনো বাধা নেই, তাই উৎকণ্ঠাও নেই। আনন্দ থাকলেও আনন্দ-চমৎকারিতা নেই। পরকীয়া-মিলন দুর্লভ, দুঃসাধ্য, সর্বলোকের নিন্দনীয়। তাই বাধা আছে বলেই তাতে বেশি প্রাবল্য, বেশি মাধুর্য। শুধু আনন্দই নয়, আনন্দ-চমৎকারিতা। 'বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্॥' নাগরীর বামতা, দুর্লভত্ব ও অভিভাবকদের নিবারণই পঞ্চশরের পরম আয়ুধের মত প্রেমিককে বিদ্ধ করে রাখে।

'প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিকের কাছে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও যথেষ্ট উন্মাদক নয়।' বলছে স্বামীজি: 'ভক্তেরা পরকীয়া প্রেমের ভাব গ্রহণ করে থাকেন, কারণ তা অত্যন্ত প্রবল। তার অবৈধতা তাঁদের লক্ষ্য নয়। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে যতই তা বাধা পায় ততই তা উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা সহজ স্বচ্ছন্দ, তাতে কোনো বাধাবিঘ্ন নেই। সেইজন্যে ভক্তেরা কল্পনা

করেন যেন কোনো নারী তার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, কিন্তু তার বাপ মা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধা পায় ততই তা দুর্বার হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেমন লীলা করতেন, সকলে উন্মত্ত হয়ে কেমন তাঁকে ভালোবাসত, তাঁর কণ্ঠস্বর বা বেণুধ্বনি শোনামাত্র গোপীরা—সেই অশেষ ভাগ্যবতী গোপীরা—সব কিছু ভুলে, জগৎ ভুলে, জগতের সকল বন্ধন ভুলে, সাংসারিক কর্তব্য সুখদুঃখ ভুলে—তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে আসত, মানুষের ভাষা তা প্রকাশ করতে অক্ষম। মানুষ, তুমি ভগবৎপ্রেমের কথা বলো, আবার জগতের সব অসার বিষয়েও নিযুক্ত থাকো, তোমার মন-মুখ কি এক?' 'যেখানে রাম আছেন সেখানে কাম নেই। যেখানে কাম আছে সেখানে রাম নেই। রবি আর রজনী একত্র থাকতে পারে না।'

'অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥'

গোপীরা কী রকম? 'স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোনো দাগ।' তারা মূর্তিমতী নির্মলতা। মূর্তিমতী নির্বাসনা। তাদের স্বসুখবাসনা নেই, তারা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ করে শুধু কৃষ্ণ সুখী হবে বলে। তাদের আত্মসুখদুঃখের বিচার নেই, তাদের সমস্ত কষ্টক্লেশ, সমস্ত মননচিন্তন কৃষ্ণসুখের উদ্দেশে। 'আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা, মনোব্যবহার॥' কৃষ্ণের জন্যে তারা বেদধর্ম লোকধর্ম সব ছেড়েছে, শুধু সেবায়-ভালোবাসায় কৃষ্ণকে সুখী করার জন্যে। কৃষ্ণের বাইরে আর তাদের তৃষ্ণা নেই। কৃষ্ণপ্রেম অর্থই তৃষ্ণাত্যাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'গোপীদের ভাব নিতে না পারিস গোপীদের টানটুকু নে।'

সেই টানেই উচাটন হয়ে স্বামীজি শেষ পর্যন্ত চলে এসেছে ভিক্ততে, পরিপূর্ণ সমর্পণে। 'আমি ধন জন চাই না, সুন্দরী কবিতা·

চাই না, এমনকি মুক্তি পর্যন্ত চাই না। এই শুধু চাই জন্মে জন্মে তোমার প্রতি আমার যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে।' 'আমি ও আমার পিতা এক।' শুধু ঈশ্বরকে ভালোবাসবার জন্যেই আমি পৃথক হয়েছি। কোনটি ভালো—চিনি হওয়া, না, চিনি খাওয়া? চিনি হওয়া, তাতে আর কী সুখ? চিনি খাওয়া—এই হল প্রেমের অনন্ত উপভোগ। 'এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণাপ্রেমে না গলে? এ রসনায় ধিক ধিক, কালী নাম নাহি বলে।' 'নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল, ওরে চিনি হওয়া ভালো নয়, চিনি খেতে ভালোবাসি॥ ওরে চতুর্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী॥'

ঈশ্বরে বিবেকানন্দের প্রগাঢ় মাতৃবুদ্ধি। মাতৃ-অঙ্কই সমস্ত মধুরের সুধাসদ্ম। তাঁর ব্রহ্মই কালী। কালীই ব্রহ্ম।

মহাচণ্ডযোগেশ্বরী গুহ্যকালী
করালী মহাডামরী সাট্টহাসা
জগদ্ভাসিনী চণ্ডিকা পালিকেতি
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥
রুবন্তী শিবাভির্বহন্তী কপালং
জয়ন্তী সুরারীন্ বধন্তী প্রসন্না
নটন্তী পতন্তী চলন্তী হসন্তী
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥

শ্রীনগরে মুসলমান মাঝির শিশুকন্যাটিকে দেখে স্বামীজি ভারি মুগ্ধ হল। নিবেদিতাকে বললে, 'আমি এই কন্যাটিকে পূজা করব।'

'পূজা করবেন?'

'হ্যাঁ, উমারূপে পূজা করব।'

পূজা করল স্বামীজি। তুমি গৌরী, তুমি অনঘা, মহাবজ্রা, মহাশক্তিধরা। তুমি সৌম্যা, সুন্দরী, মঙ্গলময়ী, সর্বাভীষ্টসাধিকা। 'নারায়ণি নমোঽস্তু তে।'

যেদিন স্বামীজি শ্রীনগর ছেড়ে যাবে, সেই ছোট্ট মেয়েটি সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে একথালা আপেল নিজ হাতে বয়ে এনে টাঙ্গায় স্বামীজিকে উপহার দিল।

সেই মেয়েটিকে স্বামীজি ভোলেনি। একবার একটি নীলফুল হাতে নিয়ে সেই মেয়েটি একা বসে-বসে অনেকক্ষণ দোলাচ্ছিল আপন মনে, সেই সুন্দর দৃশ্যটির স্মৃতি বারে-বারে তার মনে হয়েছে। কে বলবে এই অম্লানা কন্যাটিই তার উমা নয়?

একটি মুসলমান বালিকার মধ্যেও কি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভবতারিণীকে দেখেননি?

হে দেবী! হে শরণাগতজনদুঃখহারিণী! তুমি প্রসন্ন হও। হে বিশ্বেশ্বরী, অখিল জগতের জননী, তুমি প্রসন্ন হও। তুমিই পরমা মায়া, তুমিই আবার পরমমুক্তিহেতুস্বরূপা। তুমি প্রসন্ন হও।

ক্ষীরভবানী দেখে স্বামীজির নিদারুণ ক্ষোভ হল। বিধর্মীরা এসে মায়ের মন্দির ভেঙে দিচ্ছে অথচ দেশের লোকগুলো তার কোনো প্রতিকার করল না? চুপ করে সহ্য করে গেল?

অশরীরী দৈববাণী শুনল স্বামীজি: 'আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করেছে, আমার ইচ্ছে আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করব। ইচ্ছে করলে আমি কি এখুনি এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলতে পারি না? তুই কী করতে পারিস? তুই আমাকে রক্ষা করবি, না, আমি তোকে রক্ষা করব?'

শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে বলছে, 'ঐ দৈববাণী শোনা অবধি আমি আর কোনো সঙ্কল্প রাখি না। মঠ-ফঠ করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি। মায়ের যা ইচ্ছে তাই হবে।'

শিষ্য বুঝি একটু সন্দেহ প্রকাশ করতে চাইল। বললে, 'আচ্ছা আপনিই তো বলতেন দৈববাণী আমাদেরই ভিতরের ভাবের বাহ্য প্রতিধ্বনিমাত্র।'

স্বামীজি গম্ভীর হয়ে বললে, 'তা ভেতরেরই হোক আর

বাইরেরই হোক তুই যদি নিজের কানে আমার মতো ঐ রকম অশরীরী কথা শুনিস তাহলে কি সেটাকে মিথ্যে বলতে পারিস? দৈববাণী সত্যি-সত্যিই শোনা যায়, ঠিক যেমন আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে—তেমনি।'

'ভূতের কাণ্ড।'

'হ্যাঁ, ভূতের কাণ্ড!'

'তাহলে ভূতপ্রেত আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। তুই যা না দেখিস তা কি আর সত্য নয়? তোর দৃষ্টির বাইরে কত ব্রহ্মাণ্ড দূরদূরান্তরে ঘুরছে। তুই দেখতে পাস না বলে তাদের কি আর অস্তিত্ব নেই? তবে তোকে ওসব ভুতুড়ে কাণ্ডে মন দিতে হবে না, ভাববি ভূতপ্রেত আছে তো আছে। তোর কাজ হচ্ছে—এই শরীরমধ্যে যে আত্মা আছেন তাঁকে প্রত্যক্ষ করা। তুই মায়ের ছেলে, তুই বীর হবি—মহাবীর হবি—' 'ভাবো শক্তি পাবে মুক্তি বাঁধো দিয়া ভক্তি দড়া।'

রাত্রির অন্ধকার দেখছে আর গম্ভীর গদ্গদকণ্ঠে বলছে স্বামীজি: 'মা, মা, কালী, কালী।'

গঙ্গায় নৌকোতে বেড়াচ্ছে স্বামীজি। শূন্যমনে চেয়ে আছে দিগন্তের দিকে। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। নৌকো মঠের ঘাটে এসে ঠেকল। স্বামীজী গান ধরল:

'কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো॥'

নিবেদিতাকে স্বামীজি বলত তার ভবিষ্যতের কথা। কে তোমার স্বামীজি? সে গত ও মৃত। এখন আর কিছুই আশা করবার নেই, শুধু গঙ্গাতীরে এক পরিব্রাজকের জীবন, স্তব্ধ ও উলঙ্গ। কে সে স্বামীজি যে জগৎকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নেবে? কিসে তার সেই অধিকার? সমস্ত অনর্থক বাক্য, সমস্ত অহঙ্কার। স্বামীজিকে মায়ের প্রয়োজন নেই, মাকেই স্বামীজির প্রয়োজন

আমার আর কোনো কথা নেই, এই আমার শেষ কথা, আমি এখন শ্রান্ত শিশুর মত মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তে চাই।

যে শুক্রবার স্বামীজি দেহ রাখবে তার দুদিন আগে, বুধবার, নিবেদিতা এসেছে। সেদিন একাদশী, নিরম্বু উপবাস করে আছে স্বামীজি। কিন্তু নিবেদিতাকে খেতে হবে। স্বামীজি নিজেই তাকে থালায় ভাত বেড়ে দিল। আর খাওয়ার পর নিজেই জল ঢেলে নিবেদিতার হাত দুখানি ধুয়ে দিল, মুছে দিল তোয়ালে দিয়ে।

'এ কী! এ সেবা তো আমারই আপনাকে করার কথা।' ভীষণ কুণ্ঠিত হল নিবেদিতা। বললে, 'আমার জন্যে আপনি এ করবেন কেন?'

স্বামীজি গম্ভীরস্বরে বললে, 'যীশুখৃস্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।'

সেই সেবা, সেই ভক্তিই বিবেকানন্দে।

'কিন্তু সে তো শেষ সময়ে!' উত্তরটা মুখে এসেছিল, নিবেদিতা প্রাণপণ শক্তিতে চেপে গেল।

শুক্রবার রাত্রে এক গুরু-ভাই স্বপ্ন দেখল, শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয়বার দেহ রাখলেন।